মনোনীত ধর্ম

সংকলন

মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফ্ফান

(এম.এম. ফাস্ট ক্লাস, লিসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

উপস্থাপনায়

ডঃ শায়খ নাজী বিন ইব্রাহীম আল-আরফাজ

সহকারী প্রফেসর ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শরীয়া বিভাগ,

আহসা, সৌদী আরব

পশ্চিম দীরা ইসলামী সেন্টার, রিয়াদ, সৌদী আরব।

পোস্ট বক্স ১৫৪৪৯৮ রিয়াদ ১১৭৩৬ ফোন ৪৩১১১৪২ ফ্যাক্স ৪৩১১৮৭১

মনোনীত ধর্ম

সংকলন:

মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফ্‌ফান

(এম.এম. ফার্ষ্ট ক্লাস, লিসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

উপস্থাপনায়:

ডঃ শায়খ নাজী বিন ইব্রাহীম আল-আরফাজ

সহকারী ভাইস ডীন মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শরীয়া বিভাগ

সম্পাদনায়

ডঃ শায়খ আব্দুল্লাহ ফারুক

শায়খ মুহাম্মাদ মোর্তাজা বিন আয়েশ

শায়খ আব্দুল হ়ামীদ আল-ফাইযী

শায়খ সাইফুল্লাহ বিন মুজাম্মেল

শায়খ সাইফুদ্দীন বেলাল

কম্পিউটার কম্পোজ: মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াসে

পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার, রিয়াদ, সৌদী আরব।

পোষ্ট বক্স ১৫৪৪৮৮ রিয়াদ ১১৭৩৬ ফোন ৪৩৯১৯৪২ ফ্যাক্স ৪৩৯১৮৫১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

(سورة ق:٣٧)

অর্থাৎ: এতে রয়েছে শিক্ষা ও উপদেশ তার জন্য যার আছে বুঝার মত অন্ত:করণ অথবা যে মনোযোগ ও নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করে (সূরা ক্বাফ: ৩৭)

(আল কুরআন)

সূচীপত্র

মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, শরীয়া বিভাগের সহকারী ভাইস ডীন, সউদী আরবের টি.ভি চ্যানেল - ২ এর "আন্ডার স্ট্যান্ডিং ইসলাম" প্রগ্রামের প্রযোজক ও উপস্থাপক এবং "সত্যের সন্ধান" (একটিই মাত্র মিশন) সিরিজের লেখক ডঃ নাজী বিন ইব্রাহীম আল আরফাজ এর

উপস্থাপনা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক, আলেমদের ইমাম ও নাবী -রাসূলদের নেতা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহর প্রতি।

রিয়াদের পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টারে দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত সম্মানীত ভাই মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফ্ফান কর্তৃক রচিত "মনোনীত ধর্ম" বইটির সারসংক্ষেপ (আরবী ভাষায়) অবগত হয়েছি। যার মাধ্যমে আমার নিকট বইটির নিম্নোক্ত বৈশিষ্টগুলি ফুঠে উঠেঃ

১। বইটি রচনার উদ্দেশ্য হলো, অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের প্রতি দাওয়াত পৌছানো।

২। বইটি কুরআন ও হাদীসসহ অন্যান্য ধর্মের মূল, পবিত্র ও অমুসলিমদের নিকট নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী দ্বারা প্রমাণিত।

৩। বইটি ধারাবাহিকভাবে সাজানো এবং উপস্থাপন সুবিন্যস্ত ও সুসমঞ্জস।

৪। বইটির ভাষা অতি প্রাঞ্জল, সহজসাধ্য ও সর্বশ্রেণীর পাঠকের জন্য বোধগম্য ও উপযোগী।

৫। বইটি সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শের অনুসারী বিশেষ বিশেষ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিমন্ডলী দ্বারা সম্পাদিত।

পরিশেষে আমি সংশ্লিষ্ট মহলকে বইটি প্রকাশ ও প্রচারের জন্য অনুরোধ করি, এর দ্বারা যেন বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট ইসলামের সঠিক পরিচয় ফুটে উঠে। আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এর সংকলক ও যারা এর প্রকাশ ও প্রচারে নির্দেশনা ও শ্রম দিয়েছে তাদেরকে সওয়াব ও উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন।

নিবেদক

(আপনাদের ভাই)

ডঃ নাজী বিন ইব্রাহীম আল আরফাজ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের দাওয়াহ্ এণ্ড স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফীর

অভিমত

সমুদয় প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তা'য়ালার - যিনি পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলাম ধর্মকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সার্বজনীন এবং পুর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহা মানবের প্রতি যাঁর উপর আল কুরআনুল কারীম হক্ব ও বাতিল পার্থক্যকারী হিসেবে অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং অসংখ্য রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামগণের উপর যারা দ্বীনকে যথাযথভাবে পৌছে দিয়েছেন।

আল্লাহর দ্বীনের পথে আহ্বানকারী সুপ্রিয় লেখক জনাব আব্দুর রব্ব আফফান রচিত "মনোনীত ধর্ম" শীর্ষক পুস্তক সম্পর্কে নিজের অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে হৃদয়ে আনন্দ ও চোখ জুড়ানো প্রশান্তি অনুভব করছি। পুস্তকখানির মূল্যায়ন ও বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে একটি কথা উল্লেখ করা সমীচিন মনে করছি যে, আমি লেখককে তাঁর শৈশবকালীন সময় থেকে ভালবাসি এবং ভালবাসাটা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। কেননা তিনি বাল্যকাল থেকেই অতি উত্তম, অনুপম ও নির্মল চরিত্র ও আল্লাহ ভীতি গুণের অধিকারী যা খুবই সীমিত লোকের মধ্যে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, উক্ত ভালবাসা এ কারণে নয় যে , তিনি আমার বংশেরই একজন এবং আমাদের রক্তের উৎস ও শ্রোতধারাও তাঁর সাথে সম্পৃক্ত। উল্লেখ্য যে, তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, যার দ্বীনদারী, শিক্ষা, দীক্ষা, ও সংস্কৃতিতে বিশেষ সুখ্যাতি রয়েছে।

বিশেষ উল্লেখ্য যে, লেখকের দাদা আল্লামা শায়খ হেদায়াতুল্লাহ মুর্শীদাবাদী (যিনি আমারও দাদা) যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস সৈয়দ নাজীর হোসাইন মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) এর সরাসরি ছাত্র হওয়ার সুবাদে বড় মাপের আলেম এবং ইসলামের প্রচারক ছিলেন এবং লেখকের পিতা শায়খ আফফান অত্যন্ত পরহেজগার আলেম ছিলেন, যিনি কতিপয় পুস্তিকার লেখক ছিলেন এবং

কুরআনের তাফসীরের আলোকে প্রাণবন্ত খুৎবা প্রদান করতেন। লেখকের চাচা আল্লামা আবু নু'মান আব্দুল মান্নান বাংলাদেশে সালাফী উলামাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও বাগ্মী। প্রকাশ থাকে যে, লেখকের শশুর আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল জগতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী যুগশ্রেষ্ঠ সুবক্তা ছিলেন। লেখক জীবনের প্রতিটি স্তরে অতুল মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিলেন। ফলে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃতিত্বের সহিত লেখাপড়া শেষ করেন।

বইটি আমি আদ্যপান্ত পড়েছি এবং সে আলোকে এ কথা সন্দেহাতিত ভাবে বলা যায় যে, লিখক অত্যন্ত নিপুন ও সুন্দরভাবে ইসলামের সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সার্বজনীনতা সফল ভাবে তুলে ধরেছেন এবং ইসলামই যে এমন একটি ধর্মবিশ্বাস যা স্বভাবধর্ম, সহজ এবং যার সবকিছুই কল্যাণকর এবং সকল মানুষের জন্য সকল যুগে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য তা সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখক এ পুস্তকে সংক্ষিপ্ত কলেবরে কুরআন-হাদীস ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী থেকে যা শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য তাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। লেখক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর রিসালতের সত্যতা প্রমাণের যথাযত চেষ্টা করেছেন এবং তা শুধু কুরআন সুন্নাহর আলোকেই নয় বরং অন্যান্য ঐশী গ্রন্থাবলী এবং হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থ যেমন, বেদ পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদী থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন, আমার বিশ্বাস যে, এ পুস্তক অমুসলিম বিশেষভাবে হিন্দুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে সাড়া জাগাবে।

এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, লেখক এ পুস্তক প্রণয়েনে যে কঠিন শ্রম দান করেছেন, তা প্রশংসার দাবীদার। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি যেন তিনি তাঁর এ প্রচেষ্টাকে কবূল করেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের আরো অধিক খেদমত করার তৌফিক দান করেন এবং পুস্তিকাখানি সর্ব সাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় এবং সবাই যেন এর দ্বারা উপকৃত হয়।

নিবেদক

ডঃ আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী

মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ে পি, এইচ, ডি রত "সালাফী দা'ওয়া সেন্টার" (মুর্শিদাবাদ, ভারত) এর মহা পরিচালক শায়খ মহাঃ মর্তুজা বিন আয়েশ মহাঃ এর

অভিমত

সকল প্রশংসা সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সমস্ত নাবী-রাসূলদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি এবং তাঁর সাহাবা ও কিয়ামতাবধি অনুসারীদের প্রতি।

বাংলা ভাষা পৃথিবীর জীবন্ত ভাষাসমূহের একটি অন্যতম ভাষা। যে ভাষায় ভারত উপমহাদেশের বৃহৎ এলাকার প্রায় ২৫ কোটি মুসলিম ও অমুসলিম জনগণ কথা বলেন।

অতএব, তাদের সঠিক ইসলাম সম্পর্কে স্বীয় ভাষায় জানার অপরিহার্য অধিকার রয়েছে। তাই রিয়াদস্থ দ্বীরা ইসলামী সেন্টার এই ধর্মীয় অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং সাধ্যমত সঠিক ধর্মের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণের সদিচ্ছায় বাংলাভাষায় একটি গ্রন্থ সংকলনের উদ্যোগ নেয়। গ্রন্থটিতে সংক্ষিপ্ত ও সঠিকভাবে ইসলামের পরিচয়সহ ইসলামের আদর্শ ও বৈশিষ্ট সরল-সহজ ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে নেই কোন অস্পষ্টতা। এই প্রয়োজনীয় ও উপকারী গ্রন্থটি সংকলন করেন উক্ত সেন্টারে কর্মে নিয়োজিত মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিসান্স ডিগ্রি প্রাপ্ত স্নেহাস্পদ ভাই মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব বিন আফফান। তিনি গ্রন্থটি সংকলনে তার নানা ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও বহু শ্রম ও সময় ব্যয় করেন। তিনি গ্রন্থটির নাম করণ করেন "মনোনীত ধর্ম"।

আল্লাহ তায়ালা আমাকে গ্রন্থটির আদ্যপান্ত পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। আমি গ্রন্থটিকে উপকারী ও উপযুক্ত পেয়েছি।

আল্লাহ তায়ালা গ্রন্থের সংকলক এবং উক্ত ইসলামী সেন্টার এর দায়িত্বশীলদের বিশেষ করে মহাপরিচালক শায়খ আব্দুল লতীফকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা তিনি যেন গ্রন্থটির সংকলক, সম্পাদক, পাঠক, ও যারা এ উত্তম আকৃতিতে গ্রন্থটি প্রকাশে সহযোগীতা করেছেন সবাইকে এর দ্বারা উপকৃত করেন, তিনিই উত্তম প্রার্থনা কবুলকারী।

নিবেদক

মহাঃ মর্তুজা বিন আয়েশ মহাঃ

বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও অনুবাদক শায়খ আব্দুল হামীদ আল-ফাইযীর

অভিমত

রিয়ায গার্বুদ দীরা ইসলামী সেন্টারের সুযোগ্য দ্বীনী আহ্বায়ক শায়খ আব্দুর রব্ব সাহেব প্রণীত "মনোনীত ধর্ম" পুস্তিকাটির অদ্যন্ত পাঠ করলাম। দেখলাম এটিতে দ্বীনে ইসলামীর সর্বাঙ্গ-সুন্দর বৈশিষ্ট্য পরিবেশিত হয়েছে, পরিবেশিত হয়েছে অমুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত এমন সব দলীল, যা প্রমাণ করে যে, ইসলামই হল সত্য দ্বীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ হলেন সারা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রসূল (দূত) ও তাঁর সর্বশেষ নবী।

মহান আল্লাহর কাছে এই আশা করি যে, তিনি এই পুস্তিকা দ্বারা বহু পথহারা অমুসলিম মানুষকে পথের দিশা দেবেন এবং 'সীরাতে মুস্তাকীম' (সরল পথে) ফিরে আসার প্রেরণা দান করবেন।

আমি আমার ও লেখকের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী কর্ম করার প্রয়াস প্রার্থনা করি। তিনি যেন আমাদেরকে তার পথে পথিক ও পথপ্রদর্শক বানিয়ে নেন। তার দ্বীনের খিদমত এবং তাঁর 'কালেমা' সুউচ্চ করার তাওফীক দেন। তিনিই আমাদের প্রার্থনাস্থল।

বিনীত

আবু সালমান আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী

দাওয়াত অফিস, আল-মাজমাআহ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সর্বকালে সকল প্রশংসা সমস্ত জগতের অধিপতি আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সকল নাবী ও রাসূলের ইমাম আমাদের নাবী মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি। এবং তাঁর বংশধর ও কিয়ামতাবধি তাঁর সরাসরি মতাদর্শের উপর চলমান প্রকৃত অনুসারীদের প্রতি। আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমরা সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা, পয়গাম্বর ও দূত।

আল্লাহ তায়ালার জন্য অজূত সিজদায়ে শুকর জ্ঞাপন করি। যার অশেষ মেহেরবাণীতে "মনোনীত ধর্ম" নামক গ্রন্থটি বাংলাভাষীদের জন্য প্রকাশ হলো। বিভিন্ন ইসলামিক সেন্টারগুলির ইসলামী সঠিক ধর্মমত ও আদর্শের উপর সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে বিশেষ করে বাংলাভাষী অমুসলিমদের ও ব্যাপকভাবে সাধারণ মুসলমানদের জন্য মনোনীত ধর্মের বিশুদ্ধরূপ ও আদর্শ সম্বলিত একটি গ্রন্থের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করে আমাদের সেন্টারের মহা পরিচালকের নির্দেশ ও পরামর্শক্রমে, নিজের অযোগ্যতা জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এগুরুত্বপূর্ণ কাজে

অগ্রসর হই। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন:

..فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم

অর্থাৎ: "আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে হিদায়েত করেন, তবে তোমার জন্য (সর্বোত্তম) লাল উট অপেক্ষা উত্তম হবে।"(বুখারী ও মুসলিম)

গ্রন্থটিতে আমি ইসলামী সঠিক আকীদা বিশ্বাস ও ইসলামী আদর্শ কুরআন ও হাদীসের আলোকে ও মুসলিম মনীষী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থাবলীর সহযোগিতায় সঠিকভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। আর নিরোপেক্ষ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য খৃষ্টান ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ ইঞ্জিল, ও হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থাবলী: বেদ, পুরান ও মহাভারত এর বাংলা অনুদিত মূল গ্রন্থাবলী থেকে উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃতি টেনে প্রমাণ করেছি যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থে ইসলামের শেষ নাবী মুহাম্মাদ ও ইসলাম সম্পর্কে কতইনা সত্য তথ্য রয়েছে। যা সত্যান্বেষী অমুসলিমদের জন্য কতইনা সুন্দর পথ নির্দেশক এবং দুর্বল ঈমান সম্পন্ন মুসলমানদের জন্য দৃঢ়তা আনায়নকারী। যেমন আল্লাহর বানী :

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

(سورة ق:٣٧)

অর্থাৎ: "এতে রয়েছে শিক্ষা ও উপদেশ তার জন্য যার আছে বুঝার মত অন্ত:করণ অথবা যে মনোযোগ ও নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করে।" (সূরা ক্বাফ: ৩৭)

আমি আমার লিখনীতে সব ধরনের পাঠকের দিকে লক্ষ্য করে ইসলামী পরিভাষা যেমন: ঈমান, শরীয়ত, নাবী, রাসূল ইত্যাদি শব্দগুলির পরিবর্তে বা তার সাথে সাথে সরল বাংলা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি, যদিও অনেকের জন্য তা দৃষ্টি কটু ও শ্রুতিকটু হবে। আমি সাধ্যমত বইটিকে নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি কিন্তু তাতে কি হবে? নির্ভুল ও পরিপূর্ণতা তো একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। অতএব পাঠক মন্ডলীর সমীপে আরজ, বইটিতে সংঘটিত ভুল-ভ্রান্তি আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা বিবেচিত হবে।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যার তাওফীকে গ্রন্থটি রচনা করা সম্ভব হয়েছে। তারপর যাঁদের নির্দেশনা, পরামর্শ, সহায়ক গ্রন্থাবলী দ্বারা সহযোগিতা, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও অন্যান্য ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। যাঁদের শির্ষে রয়েছেন পশ্চিম দ্বীরা ইসলামিক সেন্টারের (রিয়াদ) মহা পরিচালক শায়খ আব্দুল লতীফ বিন মুহাম্মাদ আল-আব্দুল লতীফ, ও ডঃ নাজী বিন ইব্রাহীম আল-আরফাজ। এরপর

রয়েছেন: মুহাম্মাদ ইবনে সউদ বিশ্ব বিদ্যালয়ে পি, এইচ, ডি রত “সালাফী সেন্টার” (ভারত) এর মহা পরিচালক শায়খ মর্তোজা বিন আয়েশ, চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ্ ফারুক, সউদী দূতাবাস ঢাকায় কর্মরত শায়খ সাইফুল্লাহ, মাজমা ইসলামিক সেন্টারে কর্মরত শায়খ আব্দুল হামীদ ফায়যী, আহসা ইসলামিক সেন্টারে কর্মরত শায়খ সাইফুদ্দীন বেলাল, সামরিক হাসপাতাল (রিয়াদ) ইসলামী সেন্টারে কর্মরত আব্দুল্লাহ আল হাদী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন রত আব্দুল্লাহ আলকাফী ও নূরুল আলম, এবং যত্নের সাথে বইটির মুদ্রণ কাজ সম্পাদনকারী পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টারের অফিস সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াসে।

আল্লাহ তায়ালা যেন এ শ্রমটুকু আমার ও আমার মাতা-পিতা (রাহেমাহুমাল্লাহ) সহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য করেন।

বিনীত লেখক

রবের করুনা ও ক্ষমা প্রার্থী

মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফ্ফান

২৪ শে সফর ১৪২৫হিজরী, রিয়াদ

পরম দায়াময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইসলামের শাব্দিক অর্থ: আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া ও বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করা।

অতএব, যে ব্যক্তি ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করল, অনুগত হল এবং বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করল সে মুসলমান।

ইসলামের পারিভাষিক অর্থ: "তাওহীদের সাথে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা ও অনুসরণের মাধ্যমে তার বশ্যতা স্বীকার এবং শিরক থেকে পূত-পবিত্র হয়ে শিরক ও শিরককারী হতে সম্পর্কমুক্ত হওয়া।" (তিনটি মূলনীতি, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব)

ইসলাম ঐশীবাণী মনোনীত একমাত্র ধর্ম, যার প্রতি মহান আল্লাহ মানবতার জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, তিনি এ ধর্মের বাহক করে সমস্ত পয়গাম্বর- দূতের পরিসমাপ্তকারী আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদকে মানুষ ও জিন জাতিকে সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়েছেন। এর মূলমন্ত্র হল, মহান আল্লাহকে একনিষ্ঠতার সাথে প্রভুত্ব-প্রতিপালন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিতে একক সাব্যস্ত করা, যাবতীয় দাসত্ব- উপাসনা একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত করা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীতে তাঁকে একক

ও অদ্বিতীয় মেনে নেয়া, তাঁর সন্তুষ্টি ও ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত: একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর আদেশ সমূহ বাস্তবায়ন, তাঁর নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং ধর্মের নিয়ম-কানুন সর্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠা করা, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া সমস্ত উপাসনা-আরাধনার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্ধারিত পঞ্চস্তম্ভ বাস্তবায়ন, সাথে সাথে ঈমানের নির্ধারিত ৬টি স্তম্ভও মেনে নেয়া, উপাসনাবলীতে একাগ্রতাকে লালন করে আল্লাহর অভিভাবকত্ব মেনে নেয়া। ফলকথা, ইসলাম হল এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল বা দূত" এবং এর দাবীসমূহ বাস্তবায়ন করা।

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবী ﷺ এর আবির্ভাবের পূর্বে তথা প্রাক-ইসলামী যুগে আরবসহ সারা বিশ্বের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার কথা কারো অজানা নয়। ইতিহাসে সে যুগ জাহেলী তথা বর্বর ও অন্ধকার যুগ নামে পরিচিত। সে যুগের লোক স্বহস্তে নির্মিত মূর্তি পূজায় রত ছিল। কন্যা সন্তান জন্ম নেয়াকে অপমানজনক মনে করে তাকে জ্যান্ত সমাধি দেয়া হত। সামান্য কারণ অকারণে রক্তপাত নিত্য-

নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। মানুষ বিপদে আপদে ও সঙ্কটে এক আল্লাহকে ছেড়ে সমাধানের আশায় ছুটে যেত দেব-দেবী, জ্যোতিষী ও গণকদের নিকট।

অত:পর মহান আল্লাহ্ মানব জাতির প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা বশত: তাদেরকে বর্বরতার অমানিশা থেকে সৎপথের আলোর দিকে বের করার জন্য এ জগতে পাঠালেন শেষ নাবী বা পয়গাম্বর মুহাম্মাদ ﷺ কে। তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদেরকে কুফরী ও শিরক বা অংশীদারিত্বের ঘোর অন্ধকার থেকে বের করলেন ঈমান ও একত্ববাদের দীপ্ত আলোর পথে, অজ্ঞতা-অহমিকার অন্ধকার থেকে প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের পথে, অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের অন্ধকার থেকে ন্যায় ও নিষ্ঠার পথে, অনৈক্য ও মতভেদের অন্ধকার থেকে ঐক্য ও জোটের পথে, আমিত্ব ও স্বৈরতন্ত্রের অন্ধকার থেকে বিনয় ও শূরা (পরামর্শ) তন্ত্রের পথে, দরিদ্রতা ও দুঃখ-কষ্টের অন্ধকার থেকে প্রাচুর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবনযাপনের পথে, বরং তাদেরকে বের করেন অপমৃত্যুর অন্ধকার থেকে সৌভাগ্যপূর্ণ জিন্দেগীর পথে।

মহান আল্লাহ ক্রমান্বয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণতা দান করেন, এবং তাঁর মাধ্যমে সর্বোত্তম আদর্শ, ও চরিত্র,

সদাচরণকে সুসম্পন্ন করেন। আদেশ দেন বহু ইশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর উপাসনা করার, যাঁর কোন অংশীদার নেই। কেননা সমস্ত জগতের তিনিই অধিপতি, এ আধিপত্যে তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর যদি আধিপত্যে ও পরিচালনায় তাঁর অংশীদার থাকতো, তবে অবশ্যই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব, যিনি জীবন-মরণসহ সকল কিছুর একচ্ছত্র অধিপতি, যখন সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তখন শুধু তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন। যেমন যখন কোন কিছুই ছিল না তখন তিনিই ছিলেন। যাঁর শুরু নেই অন্তও নেই এবং সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান, যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, তিনিই একমাত্র যাবতীয় উপাসনার উপযুক্ত অধিকারী। উপাসনায় তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি আদেশ করেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের, আত্মীয়তার সম্পর্ক উত্তমরূপে বজায় রাখার এবং নি:স্ব-দরিদ্রের প্রতি সদাচরণ ও সহানুভূতির।

এ ধর্মকে মহান আল্লাহ বিধি-বিধানের দিক দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ করেছেন। এ ধর্মের শাসনতন্ত্রে যেমন ব্যক্তি জীবনে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে, তেমনি সমস্ত বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে, মানুষের সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, জাতীয় ও আন্ত

র্জাতিক পর্যায়ে। আর এ বিধি-বিধান শুরু থেকে শেষ দিবস পর্যন্ত সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য এর কোন বিধান অকেজো, পরিবর্তন পরিবর্ধনের অথবা সংস্কারের প্রয়োজন নেই । পক্ষান্তরে, মানুষ এ ধর্মের অনুশাসন থেকে বেরিয়ে যে সব বিকৃত মগজপ্রসূত- মানব রচিত ধর্ম ও মতবাদের দিকে ধাবিত হচ্ছে সেগুলির যে কোনটিতেই তার নিজস্ব বিধি-বিধানের পরস্পরে রয়েছে স্পষ্ট বৈপরিত্য, রয়েছে প্রকাশ্য অবিচার, মধ্য পন্থাচ্যুত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যেও রয়েছে গরমিল। এ জন্যে এগুলি সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য নয়। এগুলোর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নানা ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংস্কার। এমন অনেক মতবাদ পূর্বে ছিল কিন্তু কালচক্রে সেটি অকেজো হয়ে তার পরিবর্তে অন্য মতবাদ স্থান দখল করে। বর্তমানের জন্য যেটি উপযোগী মনে করা হয় কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর অন্যটি তার চেয়ে উপযুক্ত ও উপযোগী মনে করে পূর্বেরটি পরিবর্তন ও প্রত্যাখ্যান করা হয়। অথচ আজ ইসলাম ধর্মের নীতিমালা প্রণয়ন ও শেষ দিবস পর্যন্ত এর চুড়ান্ত করণ অতিবাহিত হয়ে গেল চৌদ্দ শতাব্দীর বেশীকাল কিন্তু এর উপযুক্ততা ও পরিপূর্নতায় কোন প্রভাব এযাবৎ পড়েনি, পড়বেও না।

কেউ যদি নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ধর্ম ও মতবাদ পর্যালোচনা করে তবে অবশ্যই ইসলাম ধর্মের প্রতিটি রীতিনীতিকে প্রত্যেক ধর্ম ও মতবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাবে। সন্দেহের অবকাশ নেই, যে ধর্ম প্রকৃত ও সত্য, তার মধ্যে রয়েছে মানবতার সার্বিক সমস্যার সমাধানের গ্যারান্টি। আর সার্বিক সমস্যা সমাধানের গ্যারান্টি একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। ইসলামই হল নিষ্কলুষ স্বভাবগত ধর্ম, প্রকৃত উন্নতধর্ম, প্রকৃত অর্থে ন্যায় নীতির ধর্ম সুসভ্যতা ও সুসংস্কৃতির ধর্ম। নারী-পুরুষের প্রকৃত স্বাধীনতা রয়েছে এর মধ্যেই। কর্ম বাস্তবায়নের ধর্ম, সামাজিকতার ধর্ম, পরস্পর সহনশীলতা শুভকামনা ও সুসম্পর্ক স্থাপনের ধর্ম এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির ধর্মই ইসলাম।

ইবাদত- উপাসনার ক্ষেত্রে যেমন তার কোন অসম্পূর্ণতা নেই তেমনি বৈষয়িক আচার-আচরণ ও লেন-দেনের নীতিমালার ক্ষেত্রেও এর কোন অসম্পূর্ণতা নেই বরং মানুষের যাবতীয় উপকার ও কল্যাণ এর মধ্যেই শেষ দিবস পর্যন্ত সংরক্ষিত। ইসলাম ধর্মের পূর্নাঙ্গতার দাবীর যৌক্তিকতা যথাস্থানে উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মানবতার উপযোগী বিধি-বিধান।

এই শরীয়ত তথা বিধি-বিধান অন্যান্য আসমানী শরীয়ত ও মানব রচিত মতবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। এ শরীয়ত স্বীয় অনুসারীদের কাছ থেকে তার সুমহান শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তবায়ন ও তার অনুশাসন ভিত্তিক জীবন যাপনের দাবী করে। ইসলাম ধর্ম কাউকে তার মধ্যে দীক্ষিত হতে বাধ্য বা তার বিধি-বিধানের প্রতি অন্ধভাবে বশ্যতার আহবান জানায় না। বরং তার অনুসারীদের এ শরীয়তের মধ্যে চিন্তা গবেষণার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

নানা কারণে ইসলাম ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ:

ক। সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বভার অর্পণ করে না

মহান আল্লাহর বাণী:

﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾

অর্থাৎ: "আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেন না যা তার সাধ্যাতীত .." (সূরা বাক্বারা, আয়াত নং ২৮৬)

ইসলামী শরীয়ত (বিধি-বিধান) মানুষের অসাধ্য এমন কোন কিছু আরোপ করে না। এমন কি মানসিক শারীরীক কোন ক্ষেত্রেই সামর্থের বাইরে কিছু নির্দেশ করে

না, বরং এ শরীয়ত সমস্ত সংকীর্ণতা, জটিলতা ও সমস্যাকে দূরীভূত করে। আর যে কোন জটিলতা দূর হবে শরীয়তের পুরাপুরি অনুসারীদের। পক্ষান্তরে অন্যদের জটিলতা বৃদ্ধিই পাবে।

খ। ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ভুলক্রমে কোন অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তার জন্য কোন শাস্তির বিধান নেই

(ত্রুটি-বিচ্যুতি: উদ্দেশ্যপূর্ণ কোন কিছু করতে গিয়ে অন্য কিছু করা, যার ইচ্ছা পোষণ করা হয়নি।
ভুল: স্মরণযোগ্য কোন কাজ বাস্তবায়নের সময় তা মনে না থাকা।)

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ত্রুটি ও ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার শিক্ষা দেন, যেমন তাঁর বাণী

﴿ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

অর্থাৎ: হে আমাদের প্রতিপালক যদি আমরা ত্রুটি করি অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে অপরাধী কর না। (বাকারাহ: ২৮৬)

এ ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার জন্য আমার উম্মত থেকে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন.. (সহীহ ইবনে মাজাহ, আলবানী)

ভুল ও ত্রুটি উভয়টি মাফ তাতে কোন পাপ নেই, যেমন কুরআন মাজীদে ভুলকারীর মার্জনা সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ سورة الأحزاب:٥

অর্থাৎ: তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা থাকলে (অপরাধ হবে); আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব:৫)

গ। ইসলাম সহজ সাধ্য ধর্ম

ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান, শিক্ষা-দীক্ষা এবং আদর্শ- সভ্যতা, সংস্কৃতি, আচরণ ও নৈতিকতা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহজ ও সাবলীল। তা ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, সবাই বরণ করতে পারে এবং এর মানদন্ডে সবাই এক, কিন্তু বেশি-বেশি সৎকাজ করা ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা বেশি মর্যাদাপূর্ন হওয়ার মাপকাঠি। নাবী সহচর ত্বলহা বিন উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নাজদের অধিবাসী এলোমেলো চুল বিশিষ্ট একজন লোক আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) নিকট আসল, অত:পর তার গুন গুন শব্দ শুনা গেল তবে সে কি বলছে

তা আমরা বুঝলাম না, এমনকি সে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং এমতাবস্থায় সে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, (ইসলাম কি?) অত:পর আল্লাহর রাসূল বললেন: দিবা-রাত্রিতে পাঁচবার নামায, অত:পর (লোকটি) বলল: এ ব্যতীত আমার উপর অতিরিক্ত কিছু রয়েছে কি? তিনি বললেন: না, তবে তুমি যদি স্বেচ্ছায় পালন কর, আর রমযান মাসের একমাস রোযা। সে বলল: এ ব্যতীত আমার উপর বেশী কিছু রয়েছে কি? তিনি বলেন: না, তবে তুমি যদি স্বেচ্ছায় পালন করতে চাও। তারপর আল্লাহর রাসূল তাকে যাকাত প্রদানের কথা বললেন: অত:পর সে বলল: এ ব্যতীত আমার উপর কি বেশি কিছু রয়েছে? তিনি বললেন: না, তবে তুমি স্বেচ্ছায় প্রদান করতে পার, বর্ণনাকারী বলেন: অত:পর লোকটি একথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল যে, আল্লাহর শপথ আমি (যা শুনলাম) এর চেয়ে বেশীও করব না কমও করব না। অত:পর আল্লাহর রাসূল বললেন: সে যদি সত্য বলে থাকে তাহলে মুক্তি পেয়ে যাবে। (মুসলিম শরীফে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)।

ইসলামী শরীয়ত, নিষিদ্ধ কাজসমূহে পতিত হলে জীবনের প্রতি হুমকি থাকার ফলে তা থেকে দূরে থাকার এবং আদেশকৃত বিষয়গুলিতে কল্যাণ থাকায় তা গ্রহণ

করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে, কেননা তা মানবজীবনকে সৌভাগ্যশীল করে। আর আদেশসূচক বিষয়গুলি পালন করা সহজসাধ্য, কঠিন নয়, যদিও এ ক্ষেত্রে মানব জীবনে কখনো অলসতা এসে যায় তবুও তার কিছু অংশ পালন করে থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী:

"যে সব বিষয় থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি তা থেকে বেঁচে থাক আর যে সব কাজের আদেশ করি সেগুলি তোমরা সাধ্যমত পালন কর, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বেশি-বেশি জিজ্ঞাসা ও তাদের নাবীর সাথে মতবিরোধের ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে।" (বুখারী শরীফ)

অতএব, এই শরীয়ত সহজ ও সাবলীল। এ জন্য এর বিধি-বিধানে কোন কষ্ট ও জটিলতা দেখা যায় না। যেমন নামায, দৈনন্দিন মাত্র পাঁচ বার, যার মধ্যে নেই কোন আর্থিক ব্যয়, নেই তেমন শারীরীক পরিশ্রম ও মানসিক কষ্ট, তবুও যতটুকু শ্রম দাঁড়ানো, উঠা-বসা ও নড়া চড়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে সেটি সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, দাঁড়িয়ে অক্ষম হলে বসে, বসে অক্ষম হলে শুয়ে শুয়েও তা পালন করার বিধান রয়েছে। রোজা তুলনামূলক কষ্টসাধ্য হওয়ায় বছরে মাত্র একমাস অপরিহার্য, তবে মুসাফির (ভ্রমণকারী) ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তাৎক্ষণিক

অপরিহার্য নয়, পরবর্তীতে আদায় করে নিবে। হজ্ব শুধু সামর্থবান ব্যক্তির জন্য জীবনে মাত্র একবার অপরিহার্য অসামর্থের জন্য নয়। তেমনি যাকাত প্রদান শুধু ধনীদের উপর অপরিহার্য গরীবদের মধ্যে বন্টণের জন্য, যদি ধনীর মাল নির্ধারিত পরিমাণে পৌঁছে এবং তা এক বছর অতিক্রম করে তবে বছরে শুধু একবারই যাকাত প্রদান করতে হবে।

পবিত্রতা অর্জন ও ওযুর জন্য পানি না পাওয়া গেলে বা অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার করতে অসমর্থ হলে পবিত্র মাটি দিয়ে নির্ধারিত পন্থায় পবিত্রতা অর্জনের কাজ সেরে নেয়া যায়। তেমনি বিশেষ জরুরী অবস্থায় বা নিরুপায় হলে অবৈধ জিনিস বৈধ হয়ে যায় যেমন মৃত পশু পাখীর মাংস খাওয়া। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার বাণী :

﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾

অর্থাৎ: আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না। (সূরা বাকারা: ১৮৫)

ঘ। ইসলাম ধর্ম মানুষের সার্বিক অবস্থার উপযোগী

এর মধ্যে রয়েছে সঠিক দিক-নির্দেশনা, দিক-দর্শন, শারীরীক ও মানসিক আরোগ্য, জ্যোতি, সব কিছুর স্পষ্ট বর্ণনা, প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়, করুণা ও রহমত, উত্তম

উত্তম উপদেশ এবং রয়েছে অসৎকর্মশীলদের জন্য ভীতি প্রদর্শন ও সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।

কুরআন কারীম আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ আসমানী পূত- পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। এটি পূর্বের সমস্ত আসমানী গ্রন্থের রহিতকারী, এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আর কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে না। ইহকালের শেষ দিবস পর্যন্ত এর উপযুক্ততার বিন্দুমাত্র অবনতি ঘটবে না। এর কোন অংশের, বাক্যের, শব্দের এমন কি কোন বর্ণেরও পরিবর্তন ঘটবে না। কেননা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহর হাতে, তাই তো দেখা যায় এর অবতীর্ণকাল ১৪ শত বছর পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে কোন রদবদল ঘটানো সম্ভব হয়নি। ইহকালের শেষ দিন পর্যন্ত সম্ভব হবেও না। কুরআনের বাণী কোন ফেরেশ্‌তা বা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও নয় বরং তা সরাসরি আল্লাহর বাণী, যার কারণেই কুরআনে এর মত বাণী আনায়নের স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও এ চ্যালেঞ্জে আরবদের সব চেয়ে বড় বড় সাহিত্যিকরা এর মুখামুখি হয়েও মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অনেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে এটা কোন কবির কবিতা নয়, কোন সাহিত্যিকের সাহিত্য নয় নিশ্চয়ই এটি আকাশ বাণী- আল্লাহর ওহী।

এই কুরআন নাবীর প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে তাঁর সহচরবৃন্দ মুখস্থ করেন এবং বিভিন্নভাবে তা সংরক্ষণ করেন। তাঁদের নিকট থেকে তা গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেন তাদের পরবর্তীগণ, এভাবে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকতার সাথে গ্রহণ ও সংরক্ষণের সূত্র চলে আসছে, শেষকাল পর্যন্ত এর কোন ব্যতিক্রম হবে না, এমনকি একজন মুসলমানের নূন্যতম কুরআন ও নামাযের প্রারম্ভিক সূরা ফাতেহা সহ তিন/চারটি সূরা অবশ্যই মুখস্থ থাকতে হয়। এজন্য আজ দেখা যায় আফ্রিকা বা ইউরোপের কোন মুসলমানের মুখে এই কুরআনের যে বাণী শুনা যাবে হুবহু ঐ বাণীই শুনা যাবে আমেরিকা বা এশিয়ার মুসলমানের মুখে, যদিও তারা পরস্পরে ভাষাতে ও বর্ণে ভিন্ন। এমনকি উক্ত বাণী থেকে কেউ যদি একটি বর্ণ বা বর্ণ সংশ্লিষ্ট চিহ্ন বিশেষও কম-বেশী করে ফেলে তবে সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধি কণ্ঠ বেজে উঠবে।

সম্মানিত পাঠক! বিশ্বের সমস্ত গ্রন্থের দিকে একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। বহুল পঠিত, বহুল প্রচারিত, ব্যাপকভাবে মুখস্থকৃত এবং তার প্রকৃতরূপে অক্ষত কোন ধর্মীয় গ্রন্থ দৃষ্টিতে পড়ে কিনা? আপনার দৃষ্টি একটি মাত্র গ্রন্থের দিকেই নিবদ্ধ হবে তা হলো আল কুরআন যা ১৪

শত বছর পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত রয়েছে অক্ষত।

পক্ষান্তরে, পয়গাম্বর ইব্রাহীমের (আলাইহিস সালাম) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল "সহীফা" মুসার (আলাইহিস সালাম) প্রতি অবতীর্ণ হয় "তাওরাত" ও ঈসার (আলাইহিস সালাম) প্রতি অবতীর্ণ হয় ইঞ্জিল (বাইবেল) কিন্তু ঈসার ইঞ্জিল তাঁকে উঠিয়ে নেয়ার পর বিলীন হয়ে যায়। খৃষ্টানদের প্রথম অধ্যায় থেকেই তার কোন অস্তিত্ব নেই, বরং তাদের পয়গাম্বর "বুলিশ" তার বিলীনের কথা ব্যক্ত করেন। আর মুসার তাওরাতও বিলুপ্ত, কিন্তু বর্তমানে যে তাওরাত বিদ্যমান তা মুসার ইন্তিকালের আট শতাব্দীর পর লিখা হয়। সুতরাং নির্ভরযোগ্য মত হলো এটি আল্লাহ মুসার প্রতি যে তাওরাত অবতীর্ণ করেন সেই তাওরাত নয় এবং ইব্রাহীম পয়গাম্বরের সহীফাও বর্তমানে নেই বরং তা তাঁর ইন্তিকালের পর অজ্ঞাত। (বিস্তারিত দেখুন "আসালীবুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়াহ আল মুয়াসারাহ")

আর হিন্দু ধর্ম হলো বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিকতা প্রভাবিত ধর্ম। তাই যখন থেকে হিন্দুদের মাঝে বহু ইশ্বর সৃষ্টি হয়, যারফলে তাদের ধর্ম গ্রন্থের সংখ্যাও শতাধিক থেকে হাজারেরও অধিকে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ

প্রদত্ত আসমানী শরীয়তগুলির পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থাবলী আল্লাহরই বাণী যা পয়গাম্বরদের প্রতি ঐশী বাণী বা প্রেরিত বাণী হিসেবে হয় কখনও শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে ভাব ও মর্ম অবতীর্ণ হয়েছে, যেমন মুসা পয়গাম্বরের প্রতি অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ও ঈসা পয়গাম্বরের প্রতি অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিল (বাইবেল)। অথবা কখনও আল্লাহর পক্ষ থেকে ভাব-মর্ম ও ভাষা অবতীর্ণ হয়েছে, যেমন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ কুরআন মাজীদ। পক্ষান্তরে, হিন্দুদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থাবলী আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বাণী তো নয়ই বরং সেগুলির অধিকাংশ কে প্রণয়ন করেছে? কার তৈরী? তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। এ সব গ্রন্থের সংকলনে ও সংস্কারে কালচক্রে বিভিন্ন যুগে অংশ গ্রহণ করে বহু সংখ্যক লোক, যা পবিত্র গ্রন্থের ক্ষেত্রে হওয়া উচিৎ নয়, সুতরাং সেগুলি একান্তই মানব রচিত মতবাদ বৈ কিছু নয়। আর স্বতসিদ্ধ কথা মানব রচিত মতবাদ কখনো ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। দ্বিতীয়ত: এসব গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই হল হিন্দুদের সব চেয়ে মহা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ “বেদ” এর ব্যাখ্যামূলক। কালচক্রে এ সব গ্রন্থের ভাষা ও ভাবগত দিক কঠিন হয়ে যায়, তাই প্রয়োজন দেখা দেয় বেদের ব্যাখ্যার, যার ফলে প্রণীত হয় অনেক নতুন ধর্মগ্রন্থ। আর এতে সংযোজন করা

হয় অনেক নতুন বিষয়। এভাবে তাদের পবিত্র বেদ বিকৃত অবস্থায় বিশাল আকার ধারণ করে যার ফলে বেদকে পুনরায় সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এভাবে বৃদ্ধি-হ্রাসের ফলে প্রকৃত বেদের সাথে এগুলির কোন মিল নেই। বর্তমানে শুধু নামে মাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ বা ধর্মীয় নতুন ইতিহাস নামে এগুলি অবশিষ্ট রয়েছে। (এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন আহমাদ শালাবি রচিত মুকারানাতুল আদইয়ান, আদিয়ানূল হিন্দ আলকুবরা)।

সুতরাং পৃথিবীর বুকে একটিই মাত্র সুসংরক্ষিত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রকৃতরূপে অবশিষ্ট ধর্মীয় গ্রন্থ হল আল কুরআন। (এটি শুধু দাবীই নয় বরং এর সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে।) পক্ষান্তরে, এই মহাগ্রন্থ ব্যতীত যাবতীয় ঐশী বা আসমানী গ্রন্থ আল্লাহর স্থায়ী গ্রন্থের জন্য পৃথিবীকে খালি করে তাদের স্বীয় অস্তিত্বকে গোপন করে বিলীন হয়ে গেছে, অতএব, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই মহা গ্রন্থের মাধ্যমেই পরিসমাপ্ত ঘটেছে ঐশী অন্যান্য গ্রন্থাবলীর, সমস্ত পয়গাম্বরীরও উপসংহার ঘটেছে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পয়গাম্বরীর মাধ্যমে। অতএব, কুরআনের পর পালনীয় ও গ্রহণীয় কোন গ্রন্থ নেই, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর আর

কোন পয়গাম্বর নেই এবং ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্ম নেই।

ঙ। ইসলাম সর্ব ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বন করে

এই শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এর যাবতীয় বিধি-বিধানে মধ্য পন্থা অনুসরণ করা, অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী দুটি দিকের মধ্য পন্থা অবলম্বন। যা প্রকৃত পক্ষে ন্যায়-নীতির সরল পথ। সুতরাং তার মধ্যে নেই কোন বাড়াবাড়ি-সীমালঙ্ঘন বা নেই কোন দুর্বলতা ও শিথিলতা বরং রয়েছে তাতে মধ্যস্থতা ও সরলতা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (سورة البقرة:١٤٣)

অর্থাৎ: এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী সরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। (সূরা বাকারা: ১৪৩)

সুতরাং ইসলাম তার অনুসারীদেরকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ন্যায় ও মধ্যপন্থা অনুসরণের আহবান করে, যাতে থাকবে না

কোন কঠোরতা বা অতি নমনীয়তা। যেমন আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আদর্শের বর্ণনা দিয়ে বলেন:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (سورة الفرقان:٦٧)

অর্থাৎ এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করবে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় (সূরা ফুরকান:৬৭)

তিনি আরো বলেন:

﴿وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (سورة الإسراء:٢٩)

অর্থাৎ তুমি তোমার হস্ত তোমার গলায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নি:স্ব হয়ে পড়বে। (সূরা বানী ইসরাঈল:২৯)

সম্মানিত পাঠক! আপনি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন। ইসলামে সর্বক্ষেত্রেই মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে। যেমন: আক্বীদা-ধর্মমত, ইবাদত- উপাসনা ও আদর্শ-চরিত্র প্রভৃতিতে। এগুলির কোন ক্ষেত্রেই নেই কঠোরতা ও চরম পন্থা আবার নেই তাতে দুর্বলতা ও শিথিলতা।

ধর্মীয় তিন মৌলিক স্তর

ইসলাম, ঈমান ও ইহসান

প্রথমতঃ ইসলাম

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভে সুপ্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল বা দূত, নামায সুপ্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, রমাযান মাসে রোযা রাখা, সামর্থবান ব্যক্তির হজ্ব করা।

(ক) সাক্ষ্য দেয়া:

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের প্রথম ও মূল স্তম্ভ হল উল্লিখিত দুটি বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া, আর এই দুই সাক্ষ্যের উদ্দেশ্যই হল: একনিষ্ঠতার সাথে উপাসনাবলীতে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা ও আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত কিছুর উপাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা এবং নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বর (দূত হিসেবে) স্বীকৃতি দেয়া, এ দুই বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়ার ফলে মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়। অত:পর তার প্রতি ইসলামের বিধি-বিধান আরোপ হয়ে যায়। আল্লাহর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ

ধর্ম বিশ্বাস হল, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, প্রভুত্ব, উপাসনা এবং নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহ একক অদ্বিতীয়।

(খ) নামায আদায় করাঃ

নামায একটি দৈহিক ও মানসিক উপাসনা। মহান আল্লাহ তা মুসলমানের উপর দিবা-রাত্রিতে পাঁচ বার ফরয করেছেন। এ নামায হল বান্দা বা দাস ও প্রভুর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ার এবং আত্মাকে পূত-পবিত্র করার, অন্যায়- পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করার, খারাপ থেকে পবিত্র করার মাধ্যম এবং নামায পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী জাহান্নামে (নরকে) অবস্থান থেকে রক্ষা করে।

নামায মুসলমানকে পার্থিব শত ব্যস্ততা থেকে তার প্রতিপালকের পথে তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে ধাবিত করে। আর তার মাঝে সে আল্লাহর সাথে কথোপকথন করত: পাপ মোচন ও সাহায্য প্রার্থনার দরখাস্ত করে। এ নামায আদায় করতে হয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী। নামায হল মুসলমানদের পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব, পরিচিতি ও ঐক্যের সেতুবন্ধন, বিশেষ করে যখন তারা ঐক্যবদ্ধভাবে পাঁচবার নামায আদায় করে এবং জুমআ ও দুই ঈদের নামায আদায় করে, তখন তার স্বরূপ ফুটে উঠে।

(গ) যাকাত প্রদান করা ঃ

যাকাত হলো আর্থিক ইবাদত বা উপাসনা। যার মধ্যে রয়েছে ধনীর নিজের স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটানোর পর অতিরিক্ত সম্পদে দরিদ্রের অধিকার। যাকাত ঐ ধনীর উপর ফরয (অপরিহার্য) যার সম্পদ নিজ ব্যয়ভার ও যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত রয়েছে তাদের ব্যয়ভার শেষে তার উদ্বৃত্ত অর্থ যদি শরীয়ত নির্ধারিত পরিমাণে পৌঁছে এবং তার উপর একবছর অতিক্রম হয় আর তা নগদ অর্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য, গৃহপালিত জন্তু, ফল, শস্যাদি ও ব্যবসার পণ্য হয় তবে উক্ত ধনী ব্যক্তি এ সব থেকে নির্ধারিত অংশ যাকাত প্রদান করবে। নগদ অর্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত বছর অন্তর একবার আর শস্য বা ফসলের যাকাত যতবার জমি থেকে ফসল উঠানো হবে। যাকাতের এই অপরিহার্যতা ধনীকে তার আর্থিক সীমালঙ্ঘন থেকে এবং দরিদ্রকে তার আত্মার মধ্যে উদয় হওয়া হিংসা থেকে রক্ষা করে।

(ঘ) রমাযান মাসে রোযা রাখা

রোযা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের চতুর্থ স্তম্ভ। রোযার দুটি দিক রয়েছে: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ দিক হল: মুসলমানের নিজেকে ফজর থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত রমাযানের

পুরা মাস মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন ও তাঁর নাবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করত: পানাহার, পাপচার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত রাখা।
পরোক্ষ দিক হল: স্বীয় সত্ত্বায় আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি, হৃদয়ে প্রগাঢ় সহনশীলতা, অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং সৎ ও উত্তম কর্ম আঞ্জাম দেয়ার জন্য হৃদয় উন্মুক্ত হওয়া।

৬) সামর্থবান ব্যক্তির আল্লাহর ঘর কাবার হজ্ব আদায় করা

হজ্ব ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের পঞ্চম স্তম্ভ। এটি মুসলমানের মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক উপাসনা। হজ্ব মুসলমানদের সামর্থবান ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ পালন ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সেলাইযুক্ত ও আকর্ষণীয় পোশাক বর্জন করে অন্যের প্রতি সীমালঙ্ঘন ও কষ্ট প্রদান থেকে বিরত হয়ে নির্ধারিত সময় ও স্থানে এবং নাবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্ধারিত পদ্ধতিতে পালন করে থাকে। হজ্ব মুসলমানদের একটি মহাসম্মেলন। যার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় পরস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, পরামর্শ ও পরিচিতি গ্রহণ।

দ্বিতীয়ত ঃ ঈমান

ঈমান হল আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তামন্ডলী, তাঁর অবতরণকৃত গ্রন্থাবলী, তাঁর প্রেরিত পুরুষগণ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও বিশ্বাস স্থাপন করা যে, ভাগ্য-নিয়তির ভালমন্দ সব আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর তার প্রকৃত রূপ হলো মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরে দৃঢ় আস্থা (বিশ্বাস) ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কার্যে পরিণত করা। ঈমান উপাসনার মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং পাপ-অবাধ্যতার ফলে হ্রাস পায়। এর প্রায় সত্তরেরও অধিক শাখা প্রশাখা রয়েছে, এরমধ্যে ‘সর্বোত্তম হলো, “ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” তথা আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই বলা, আর সর্বনিম্ন শাখা হল, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা”। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসায়ী ও ইবনে মাযাহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত)

ঈমানের স্তম্ভ ছয়টি

১। আল্লাহর প্রতি ঈমান

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হল: বিশ্বাস করা যে, তিনি একক অদ্বিতীয়, কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ, তাঁর দেয়া

অঙ্গীকার ও হুঁশিয়ারী, প্রতিদান ও শাস্তি অবধারিত ও সুনির্ধারিত, তিনি আরশের উপরে আছেন কিন্তু তাঁর জ্ঞান দয়া ও সাহায্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত এবং তিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আরো ঈমান রাখা যে, তিনি তাঁর প্রভুত্বে, উপাসনার অধিকারীত্বে এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীতে একক তাঁর কোন অংশীদার নেই।

২। ফেরেশ্‌তামন্ডলীর প্রতি বিশ্বাস

মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত রয়েছে অগণিত ফেরেশ্‌তা। এদেরকে আল্লাহ নূর (জ্যোতি) হতে সৃষ্টি করেছেন। এরা সম্মানিত ও আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা এরা আল্লাহর উপাসনায় সদা নিয়োজিত এবং তাঁর আদেশ পালনার্থে সদা প্রস্তুত। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য হলো: জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও মালাকুল মাউত।

৩। আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বাস

মহান আল্লাহ যেমন অসংখ্য পয়গাম্বর ও দূত প্রেরণ করেছেন তেমনি তাদের অনেকের প্রতি মানবতার পথ প্রদর্শন, কল্যাণ ও সংস্কারের জন্য অবতীর্ণ করেন বহু ঐশীগ্রন্থ। তার মধ্যে বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য হল: পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ 'তাওরাত', ঈসা

আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ 'ইঞ্জিল', দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ 'যবূর' এবং সর্বশেষ পয়গাম্বর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ মহা গ্রন্থ 'আল কুরআন'। আল কুরআন ঐশী গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ, এর মাধ্যমে আল্লাহ পূর্বের সমস্ত ঐশী গ্রন্থকে রহিত করেছেন, এটি শেষ দিবস পর্যন্ত পৃথিবীতে অক্ষতভাবে বলবৎ থাকবে। এ যাবৎ এর কোন রদবদল হয়নি, হবেও না। কেননা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং মহান আল্লাহই নিয়েছেন। কুরআনের প্রতি বিশ্বাসের দাবী হলো, তা পাঠ করা, গবেষণা করা ও এর ভিত্তিতে জীবন গড়া।

৪। নাবী-পয়গাম্বরদের প্রতি বিশ্বাস

মহান আল্লাহ জগতে অনেক নাবী-রাসূল (পয়গাম্বর)মানুষের পথ প্রদর্শন ও কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা সবাই আল্লাহ কর্তৃক সৃজিত মানুষ ছিলেন। কেউ নূর দ্বারা সৃজিত নয়। তাঁরা আল্লাহর উপাসনা-দাসত্বের জন্য অন্যতম ছিলেন এবং আল্লাহ তাদেরকে রিসালাত-পয়গাম্বরী প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেন। নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর।

তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ রিসালাত-পয়গাম্বরীর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তাঁর প্রতি ঈমান-বিশ্বাসের দাবী হলোঃ তাঁকে ভালবাসা, সত্য মনে করা, তাঁর আদেশসমূহ পালন, নিষেধসমূহ থেকে বেঁচে থাকা, তাঁর প্রদর্শিত বিধি-বিধান অনুযায়ী সমাধান-ফয়সালা করা, তাঁর সুন্নাত-আদর্শ বাস্ত বায়ন করা এবং তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব বিষয়ে খবর দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা।

৫। কিয়ামত (পরকাল) দিবসের প্রতি বিশ্বাস

কিয়ামত হল পার্থিব জগতের শেষদিন। ঐদিন আল্লাহ সমস্ত মানুষকে কবর-সমাধি থেকে জীবিত উঠিয়ে পৃথিবীর কৃতকর্মের পরিপূর্ণ হিসাব নেয়ার পর তাদেরকে তাদের অনন্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন। যারা সৎকর্মশীল তাদেরকে চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাতে (স্বর্গে) পাঠাবেন, আর যারা অসৎকর্মশীল তাদেরকে জাহান্নামে (নরকে)। পরকালের প্রতি বিশ্বাসের দাবী হলো মৃত্যুর পর যা কিছু ঘটবে সব কিছুর প্রতি বিশ্বাস, যেমনঃ কবর-সমাধির পর আযাব, পরীক্ষা, পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের জন্যে সমবেত হওয়া, তারপর জান্নাত বা জাহান্নামে গমন।

৬। তাকদীর-ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস

তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হলো: বিশ্বাস রাখা যে, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টির বহু পূর্বে তাদের কৃতকর্ম ও তাকদীর-ভাগ্য সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তা পূর্বেই নিরূপণ করে লওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখে রেখেছেন এবং যে সময়ের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা ঠিক সেই সময়েই সংঘটিত হবে নির্ধারিত সময়ের বিন্দু মাত্র আগে পিছে হবে না। অতএব যা কিছু মানুষের ভাগ্যে রয়েছে তা অবশ্যই হবে আর যা ভাগ্যে লিপিবদ্ধ নেই তা কখনো হবে না। কেননা, ভাগ্য-তাকদীরের খাতা থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং যা লিখার ছিল তা লিখা হয়ে গেছে।

তৃতীয়ত: ইহ্সান

ইহসান হল, ইসলাম ও ঈমানের দাবীসমূহ পুরাপুরি বাস্তবায়নান্তে ধর্মের সর্বোচ্চ স্তর। অতএব, ইহসানের দাবী হল, পূর্বের অর্পিত সব কিছু মেনে নিয়ে যাবতীয় কৃতকর্ম ও উপাসনা এমনভাবে বাস্তবায়ন করা যে, সে যেন মহান আল্লাহকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করছে। আর যদি এতটুকু তার জ্ঞান করা সম্ভব না হয় তবে সে কম পক্ষে মনে করবে যে

মহান আল্লাহ তার প্রতিটি কর্ম, উপাসনা ও সকল চিন্তা, চেতনা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন ও প্রত্যক্ষ করছেন।

ইসলাম ধর্মের শেষ নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (জন্ম: ৫৭১ খৃষ্টাব্দ:-মৃত্যু ৬৩২ খৃষ্টাব্দ): মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে ৫৭১ খৃ: জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমেনা। আল্লাহ তাঁকে শিশুকাল থেকেই বিশেষ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পূত পবিত্র রাখেন। যার ফলে তিনি তাঁর জাতির মধ্যে সর্বোত্তম আদব-চরিত্রের অধিকারী ও ধৈর্য-সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে ছিলেন সুমহান। তিনি ছিলেন সর্বাধিক সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী এবং যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে অনেক দূরে। এজন্য তাঁর জাতির মধ্যে তিনি "আল আমিন" (আমানতদার বা বিশ্বস্ত) নামে পরিচিত ছিলেন। ২৫ বছর বয়সে তিনি এক সম্ভ্রান্ত উচ্চ বংশীয় মহিলা "খাদীজা" কে বিবাহ করেন। ৪০ বছর বয়সে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বরী লাভ করেন। অত:পর তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধানের প্রচার কাজে আদিষ্ট হয়ে লোকদেরকে বিচক্ষণতার সাথে উত্তম উপদেশাবলীর মাধ্যমে ইসলামের

পথে আহবান করা শুরু করেন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সীরাত ইবনে হিশাম ও আর রাহীকুল মাখতূম সহ অন্যান্য সীরাত গ্রন্থ)

তিনিই ইসলাম ধর্মকে সমস্ত ধর্মের পরিসমাপ্তকারী রূপে বিশ্বস্তার সাথে প্রচার করেন। একত্ববাদী ধর্ম বিশ্বাসকে বিস্তার করে ইসলামী বিধি-বিধানকে বাস্তবায়ন করেন।

অত:পর তিনি মানব সমাজকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে সৎপথের আলোর দিকে, অজ্ঞতা-বর্বরতার অন্ধকার থেকে শিক্ষা-দীক্ষা, প্রজ্ঞা ও সভ্যতার আলোতে, অংশীদারিত্ব ও কুফর-অবিশ্বাস ও বহু ঈশ্বরবাদের অন্ধকার থেকে একত্ববাদ- এক আল্লাহতে বিশ্বাসের আলোর পথে, অন্যায় অবিচার ও জুলুম নির্যাতনের অন্ধকার থেকে ন্যায় পরায়ণতা ও একাগ্রতার আলোর দিকে আহবান করেন। সামাজিক ও মানব রচিত মতবাদের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার অন্ধকার থেকে সঠিক-সুষ্ঠ ও স্থিতিশীলতার আলোতে এবং আত্মিক সংকীর্ণতা ও অস্থিরতার অন্ধকার থেকে হৃদয়ের প্রশান্তি ও আলোর দিকে স্থানান্তর করেন।

ইসলাম ব্যাপকভাবে সমস্ত পয়গাম্বর ও রাসূলের ধর্ম। আর তাঁরা মানুষদেরকে মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহর উপাসনার পথে আহবান করেন। তাঁরা আল্লাহ

প্রদত্ত পয়গাম্বরীর দায়িত্ব পৌঁছানোর মাধ্যমে মানবতাকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তাঁরা স্বীয় জাতিকে ইহকালীন ক্ষণস্থায়ী ও সীমিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জীবিকা থেকে পরকালীন অনন্ত ও চিরস্থায়ী জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিকে আহবান করেন। এই শেষ পয়গাম্বর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামত পর্যন্ত মানবতাকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য এক পরিপূর্ণ ব্যাপক ও সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা নিয়ে আসেন।

কোন মুসলমান আল্লাহর সমস্ত পয়গাম্বর-রাসূল, ফেরেস্তা, ঐশী গ্রন্থাবলীর প্রতি বিশ্বাস না আনলে সে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে না। আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মেই আহবান জানানো হয়েছে একত্ববাদ এবং এক আল্লাহর উপাসনার দিকে। আর ঐ পথকেই মানবতার জন্য আলোকিত করার নিমিত্তে মশাল হাতে আগমন করেন সমস্ত পয়গাম্বরের পরিসমাপ্তকারী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)যার পর আর কোন পয়গাম্বর আসবে না । মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

(سورة المائدة:١٦)

অর্থাৎ: যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর দ্বারা তিনি তাদেরক শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন। (আল কুরআন: সূরা মায়িদাহ:১৬ আয়াত)।

পয়গাম্বর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পয়গাম্বরী লাভের পর ২৩ বছর যাবৎ আল্লাহর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশনায় ইসলামী বিধি-বিধান বা পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ সুসম্পূর্ণ করেন তারপর আল্লাহ তার মৃত্যু দান করেন ৬৩২খৃঃ সনে। আল্লাহ জিবরীল ফেরেশ্‌তা মারফত তাঁর যে বাণী সরাসরি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ করেন তা আল কুরআন নামে অভিহিত। আর পয়গাম্বর মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বাণী, কিন্তু ভাব-মর্ম হল আল্লাহর পক্ষ থেকে তা হাদীস বা সুন্নাত নামে অভিহিত। তাই আল কুরআন ও হাদীস এ দুটি ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস।

মুহাম্মাদ ﷺ এর পয়গাম্বরী লাভের প্রমাণপঞ্জি

প্রথমত: যুক্তি

শুধুমাত্র মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্যের উপায়-উপকরণ এবং এর রহস্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

জ্ঞান সর্বক্ষেত্রে অকল্যাণ থেকে কল্যাণ নিরুপণের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। কেননা বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, কোন বিষয় ভাল মনে করা হলেও সেটি মন্দে পরিণত হয়েছে তেমনিভাবে জ্ঞানের নিকট কোন বিষয় মন্দ লাগলেও তার মধ্যে রয়েছে কল্যাণ। যেমন মহান আল্লাহর বাণী

﴿عَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة:٢١٦)

অর্থাৎ: আর তোমরা যা অপছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালবাস সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর, আল্লাহ জানেন আর তোমরা জাননা। (বাকারা:২১৬)

সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিধি যতই পর্যাপ্ত হোক আর তার অর্জন যতটুকুই হোক জ্ঞানের ধারণশক্তি নিতান্তই সীমিত এ জন্যে তা স্বীয় গন্ডির অভ্যন্ত

রেই আবর্তন করে। এজন্যই সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিজীব ও নিজের প্রতি মানুষের কি করণীয় ও কি অধিকার, তার সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য পয়গাম্বর বা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত দূতের প্রয়োজন। সুতরাং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অসীম কৃপা যে, তিনি আমাদের মধ্য থেকে আমাদের কল্যাণের জন্য একজন রাসূল বা দূত প্রেরণ করেন ও কুরআনকে আমাদের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সংবিধান স্বরূপ অবতীর্ণ করেন। তাই তো আমাদের নাবী- পয়গাম্বর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পয়গাম্বরী ঐশী বাণী, জ্ঞান-বিবেক, যুক্তি ও বাস্তবতার ভিত্তিতে সুসাব্যস্ত, এর প্রমাণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

দ্বিতীয়ত: ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে মুহাম্মাদের ﷺ পয়গাম্বরীর প্রমাণ ও শুভাগমনের সুসংবাদ

পয়গাম্বর-নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর উম্মত সম্পর্কে যে আলোচনা পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থাবলীতে রয়েছে কুরআনে তার বর্ণনা বহু জায়গায় রয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গাম্বর বা নাবীগণ তাঁর সম্পর্কে শুভ সংবাদ দিয়েছেন বরং আল্লাহ প্রত্যেক নাবী থেকে এই মর্মে

অঙ্গীকার নেন যে, তারা যেন স্বীয় জাতিকে তাঁর ব্যাপারে ও তাঁর কতিপয় গুণাবলীর সুসংবাদ দেন এবং স্বীয় জাতির নিকট থেকে এ অঙ্গীকার নেন যে, তিনি যদি তাদের জীবদ্দশায় আবির্ভূত হন তবে যেন তারা তাঁর অনুসরণ ও সাহায্য করে। এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (سورة آل عمران: ٨١)

অর্থাৎ: যখন আল্লাহ্ নাবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা যা কিছু দিয়েছি, অত:পর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক রূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন: তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বললো: আমরা স্বীকার করলাম। মহান আল্লাহ্ বললেন: তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। (সূরা আলে ইমরান:৮১)

১। ঐশী গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলে (বাইবেল) নাবী মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে সুসংবাদ

যেমন তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত সংবাদ সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য:

প্রথম:

﴿ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

(سورة الأعراف:١٥٦-١٥٧)

অর্থাৎ: সুতরাং কল্যাণ আমি তাদের জন্যই অবধারিত করবো যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। (এই কল্যাণ তাদেরই প্রাপ্য) যারা সেই নিরক্ষর বার্তাবাহক নাবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করে চলে, যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও

ইঞ্জিল কিতাবে লিখিত পায়, সে (নিরক্ষর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু সমূহ বৈধ করে দেয় এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে। আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন (অর্থাৎ কঠিন বিধানাবলী যা পূর্ববর্তী শরীয়তে ছিল) হতে তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তার সম্মান করে ও সাহায্য-সহযোগিতা করে। এবং ঐ আলোক বর্তিকার অনুসরণ করে চলে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই (ইহকাল ও পরকালে) সাফল্য লাভ করবে। (সূরা আ'রাফ: ১৫৬-১৫৭)

দ্বিতীয়:

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ (سورة الصف:٦)

অর্থাৎ: স্মরণ কর, মারইয়াম পুত্র ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন: হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল (বার্তাবাহক) এবং আমার পূর্বে হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক

এবং আমার পর আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদ দাতা। (সূরা সাফ: ৬)

তৃতীয়:

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ ﴾ (سورة الفتح:٢٩)

অর্থাৎ: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল (বার্তা বাহক); তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জিলেও...। (সূরা ফাতহ: ২৯)

ঐশী গ্রন্থসমূহে পয়গাম্বর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়াতের (পয়গাম্বরীর) নাম, ভাষা, গুণাবলী, তাঁর উম্মতের গুণাবলী স্পষ্টভাবে

বর্ণিত হয়েছে, এর মধ্যে কোন অপব্যাখ্যার অবকাশ নেই। সত্যসন্ধানির জন্য উচিৎ দলীল-প্রমাণ পেলে তা গ্রহণ করে তার অনুসরণ করা। আর যেখানে এ ব্যাপারে অগণিত প্রমাণ বিদ্যমান তাই তার অবস্থা আরো সুদৃঢ়। যারা গোঁড়ামীবশত: নিতান্ত দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত যুক্তির আশ্রয়ে নিশ্চিত স্পষ্ট পূর্বাভাসে বর্ণিত পয়গাম্বরের নাম, গুণাবলী, স্থান ও তাঁর উম্মত সম্পর্কে খবরসমূহকে অপব্যাখ্যা করে পয়গাম্বর ঈসা-মসীহ আলাইহিস সালামের দিকে সম্পর্কিত করতে চায়, অথচ স্বয়ং তিনিও তাঁর সহচরগণ পয়গাম্বর মুহম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অতি সত্ত্বর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এসব পূর্বাভাস ও সংবাদ বাইবেলে (OLD TESTAMENT ও NEW TESTAMENT) স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, যদিও এর অধিকাংশ কাট-ছাট ও রদবদল করা হয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন: আসালিবুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া আল মুয়াসারাহ)

উদাহরণস্বরূপ ইঞ্জিল থেকে দু একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলো:

ইঞ্জিলে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে সুসংবাদ

ঈসা (আলাইহিস সালাম) তিরোধানের পূর্বে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুভাগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করত: বলেন:

(১) ..."তবুও আমি তোমাদের সত্য কথা বলিতেছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাহাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিব। তিনি আসিয়া দুনিয়াকে পাপের সম্বন্ধে, নির্দোষিতার সম্বন্ধে এবং খোদার বিচারের সম্বন্ধে চেতনা দিবেন। (দেখুন: ইঞ্জিল শরীফ, বাংলা অনুবাদ ৪র্থ খন্ড: ইউহোন্না: ৭,৮ও ৯ আয়াত পৃ:২৮০)।

(২) ইঞ্জিলের উক্ত খন্ডের ১২ ও ১৩ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে: (ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন:) "তোমাদের নিকট আরও অনেক কথা আমার বলিবার আছে, কিন্তু এখন তোমরা সেই কথা সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু সেই সত্যের রূহ যখন আসিবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখাইয়া পূর্ণ সত্যে লইয়া যাইবেন। তিনি নিজ হইতে কথা বলিবেন না, কিন্তু যাহা কিছু শুনেন তাহাই বলিবেন, আর যাহা কিছু ঘটিবে তাহাও তিনি তোমাদের জানাইবেন।"

প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত উদ্ধৃতিদ্বয়ের প্রথমটিতে রয়েছে, ঈসা (আলাইহিস সালাম) তাঁর অনুসারিদেরকে আগত ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বলেন: "তিনি আসিয়া দুনিয়াকে পাপের সম্বন্ধে, নির্দোষিতার সম্বন্ধে এবং খোদার বিচার সম্বন্ধে চেতনা দিবেন।"

এ অধ্যায়ে বর্ণিত আয়াতগুলি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে, ইঞ্জিলে যেরূপ বর্ণনা রয়েছে, কুরআনেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে এবং ইঞ্জিলে ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর উদ্ধৃতি দিয়ে যার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তাঁর নাম উল্লেখ করে কুরআনও স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে। যা কিছু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

ইঞ্জিলের দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, (ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন:) "সেই সত্যের রূহ যখন আসিবেন তখন তিনি তোমাদের পথ দেখাইয়া পূর্ণ সত্যে লইয়া যাইবেন।" কুরআনেও আল্লাহ তায়ালা অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন যেমন তিনি বলেন:

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (سورة الشورى: ٥٢)

অর্থাৎ " আর তুমি নিশ্চয়ই সরল পথ প্রদর্শন করবে।" (সূরা শূরা: আয়াত: ৫২)

এই উদ্ধৃতির শেষ অংশে ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেন: "তিনি নিজ হইতে কথা বলিবেন না, কিন্তু যাহা কিছু শুনেন তাহাই বলিবেন।"

আল্লাহর পক্ষ থেকে আল কুরআনেও অনুরূপ বাণী এসেছে:

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (سورة النجم٣-٤)

অর্থাৎ: আর সে মনগড়া কথাও বলে না। ওতো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (সূরা নাজম: ৩-৪)

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন ইঞ্জিলে উল্লেখিত উদ্ধৃতিদ্বয়ে, ঈসা (আলাইহিস সালাম) যে ব্যক্তিত্বের পূর্বাভাস দিয়েছেন, আল কুরআনেও অনুরূপভাবে সে ব্যক্তিত্বেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, আর সে ব্যক্তিত্ব হলো শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এ ধরনের বহু উক্তি ইঞ্জিলে রয়েছে।

২। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে সুসংবাদ

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শুভাগমনের সুসংবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলে (বাইবেল) উল্লেখ রয়েছে, যদিও ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা আপন-আপন গ্রন্থের

শব্দ ও অর্থে বিভিন্নভাবে রদবদল করে ফেলেছে কিন্তু তবুও এগুলিতে তার আগমনের পূর্বাভাস রয়ে গেছে। এ পূর্বাভাস যখন মুসলমান আলেমগণ তাদের নিকট তুলে ধরেন তখন তাদের মধ্যকার যারা প্রকৃত-খাঁটি বিবেকসম্পন্ন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী তাদের নিকট ইসলামের সত্যতা ফুটে উঠে এবং ইসলামে দীক্ষিত হয়ে থাকেন।

অনুরূপ হিন্দু ধর্মের গ্রন্থসমূহেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে অসংখ্য ও স্পষ্ট পূর্বাভাস রয়েছে যা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ইসলামের সত্যতার জলন্ত প্রমাণ বহন করে। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ “বেদ” যেহেতু সবচেয়ে পুরাতন ও তাদের নিকট সর্ব শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণ যোগ্য, তাই এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ উদ্ধৃতি এই “বেদ” থেকে এবং কিছু কিছু পুরাণ, রামায়ন ও মহাভারত থেকে সরাসরি উপস্থাপন করে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ করা হবে, আশা করি সুষ্ট ও নিরপেক্ষ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের তা সত্যান্বেষণে সহায়ক হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সত্য বর্ণনা করার এবং গ্রহণ করার সামর্থ দিন।

ক) বেদসমূহে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

ভারত উপমহাদেশে হিন্দু ধর্ম একটি প্রাচীন ও সুপরিচিত ধর্ম এবং বেদ হল হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ। পয়গাম্বর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে বহু স্পষ্ট পূর্বাভাস রয়েছে। পূর্বাভাস বা ভবিষ্যদ্বাণীর সাধারণত: দুটি বৈশিষ্ট: পূর্বাভাস যার সম্পর্কে করা হয় হয়তবা তার নাম উল্লেখ করা হয় অথবা নাম উল্লেখ না করেই তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের এমন চিত্র বর্ণনা করা হয় যে, যখন তিনি প্রকাশ পান তখনই তাকে চিনতে ও বুঝতে কোন রকমের সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে হিন্দু গ্রন্থসমূহে যে পূর্বাভাস রয়েছে তাতে উক্ত দুধরনেরই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অর্থাৎ তাতে তাঁর নামও বর্ণনা করা হয়েছে এবং একমাত্র তাঁরই সাথে সম্পর্কিত গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে, যা তাঁর মধ্যে ছাড়া আর কারো মধ্যে বিদ্যমান নেই। তাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত পূর্বাভাসে যে গুণাবলী রয়েছে তা তাঁরই জন্য নির্ধারিত।

হিন্দু ধর্মের সর্বাধিক পরিচিত ও সর্ব প্রথম ধর্মীয় গ্রন্থ হলো “বেদ” আর “বেদ” হলো চারটি: ঋক বেদ, যাজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। (দেখুন: শ্রীবিজন বিহারী

গোস্বামী অনুদিত অথর্ববেদ- সংহিতা, অনুবাদকের লেখা ভুমিকার ১ম পৃষ্ঠা) বেদ চতুষ্টয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্ণনা রয়েছে, তার মধ্যে অথর্ব বেদে রয়েছে বিস্তারিত। (দেখুন: "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দু কিতাবু মে") এখানে শুধু নমুনা স্বরূপ উক্ত বেদের মন্ত্রের কিছু উপস্থাপন করা হলো:

১। অথর্ব্ব বেদের ২০তম কান্ড, নবম অনুবাক, একত্রিংশ সূক্ত, ৪৭২ পৃষ্ঠার প্রথম মন্ত্রে রয়েছে:

ইদং জনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিংচ কৌরম আ রুশমেষু দদ্মহে।।

অর্থ: হে মানব মন্ডলী! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর! "নরাশন্স" এর প্রশংসা করা হবে। আমি এই মুহাজির (দেশত্যাগকারী) বা প্রশান্তির ঝান্ডাবাহীকে ৬০ হাজার ৯০জন শত্রুর মাঝে সুরক্ষিত রাখবো।

উক্ত মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: "মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর" এর মাধ্যমে এখানে যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বেদ বিশেষজ্ঞদের মতে বেদের অন্য কোথাও আর পাওয়া যায় না। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, এখানে যে ব্যক্তিত্বের বর্ণনা আসছে তিনি বেদের বর্ণনার অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের চেয়ে ব্যতিক্রম ও মহান। "নরাশন্স" শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, যা মূলত দুটি শব্দ মিলে গঠিত। এক শব্দ হলো "নর" যার

অর্থ হল মানুষ "নর" শব্দটি এনে বুঝানো হয়েছে যে, যার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে তিনি বেদের অন্যান্য সত্ত্বার মত কোন দেবতা (ফেরেশ্‌তা বা জিন) নন বরং তিনি মানুষের অন্ত র্ভুক্ত। এর দ্বারা এমন অনেকের ধারনাও খণ্ডন হয়, যারা মনে করে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূরের তৈরি।

দ্বিতীয় শব্দ "আশন্স" এর অর্থ হলো: এমন ব্যক্তি যার বেশী-বেশী প্রশংসা করা হয়। অতএব "নরাশন্স" এর হুবহু ঐ অর্থ যা 'মুহাম্মাদ' শব্দের অর্থ। শব্দ দুটির মধ্যে 'মুহাম্মাদ' আরবী এবং নরাশন্স সংস্কৃতি শব্দ এ পার্থক্য ছাড়া আর অন্য কোন পার্থক্য নেই। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে বেদের বর্ণনায় নরাশন্সই যথেষ্ট ছিল কিন্তু এরপর আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, নরাশন্স এর প্রশংসা করা হবে।

প্রিয় পাঠক! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এত বেশী প্রশংসা করা হয়েছে, যার অনুমান করা এবং তাঁর জীবন-চরিত ও প্রশংসার উপর এত অধিক গ্রন্থ লিখা হয়েছে যে, তা নিরুপণ করাই অসম্ভব। মুসলমান তো লিখেছে লিখবেই, কিন্তু অন্যান্য ধর্মের অনুসারীগণ যে তাঁর গুণকীর্তন ও প্রশংসার ব্যাপারে এত কিছু লিখেছেন যে, স্বীয় ধর্মের পয়গাম্বর, পন্ডিত, পাদরী ও যাজকদের

ব্যাপারে এর তুলনায় কিছুই লিখেনি বরং বাস্তবতা হল তাদের নিকট তাদের পয়গাম্বর ও পুরোহিতদের সম্পর্কে বেশী কিছু লিখারও নেই। মুসা আলাইহিস সালামের এত অবদান থাকা সত্ত্বেও ইয়াহুদীদের তার প্রতি সর্বদাই অভিযোগ রয়ে গেছে।

খৃষ্টানদের নিকট ঈসা আলাইহিস সালামের কিছু অলৌকিক ঘটনাবলী, কিছু চিত্র, কিছু মিষ্ট-তিক্ত বর্ণনা এবং শুলে আরোহণ ও আকাশপানে গমনের কাহিনী ব্যতীত আর তেমন কিছু নেই, তবুও তার মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে প্রশংসার চেয়ে মানহানিকর।

এ ক্ষেত্রে হিন্দু ব্যক্তিত্বগণ আরো বেশী আড়ালে রয়েছেন। তারপরও তাদের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তুলনায় এমন, যেমন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোটা পানি।

আলোচ্য পূর্বাভাসে ভবিষ্যৎকালের শব্দ প্রয়োগ হয়েছে, বর্ণিত হয়েছে যে, “নরাশন্স” এর প্রশংসা করা হবে।

যেহেতু আলোচ্য পূর্বাভাস অথর্ব বেদে এসেছে আর ধর্মীয় গবেষকগণ একমত যে অথর্ব বেদ চতুর্বেদের সর্বশেষ বেদ, পূর্বের তিন বেদের বহু পরে লিখা হয়েছে। এই মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে ‘নরাশন্স’কে “কৌরম” বলা

হয়েছে, “কৌরম’ শব্দের দুটি অর্থ, প্রথম: মুহাজির বা স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগকারী। দ্বিতীয়: শান্তি-নিরাপত্তার পতাকাবাহী। এই দুই অর্থের উভয় অর্থই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর সর্বাধিক প্রযোজ্য। কেননা তিনিই তাঁর জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনা হিজরত করেন, যা পয়গাম্বরদের ইতিহাসে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা।

দ্বিতীয়ত: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শান্তি -নিরাপত্তার পতাকাবাহী ছিলেন, তার প্রমাণ তিনি যখন আত্ম প্রকাশ ও পয়গাম্বরী লাভ করেন তখন মদীনায় (যেখানে তিনি হিজরত করেন) আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে থেমে থেমে একশত বছর যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই ছিল, পূর্ব আরবের বকর ও তাগলব গোত্রদ্বয়ের মধ্যে ৪০ বছর যাবৎ লড়াই চলছিল, মধ্য আরবে আবস ও যুবইয়ান গোত্রদ্বয়ে কলহ-বিদ্রোহ লেগে ছিল, ইয়ামানের ইয়াহুদী শাসকবৃন্দ নাজরানের খৃষ্টান অধিবাসীদেরকে জীবিত জ্বালিয়ে দিয়েছিল এর প্রতিশোধে হাবশের খৃষ্টানরা ইয়ামন দখল করে তার সমুচিত জবাব দেয়। তারপর কাবা শরীফ ধ্বংস করতে চাইলে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি এসে তাদের মাজা ভেঙ্গে দেয়। মোট কথা চতুর্দিকে যুদ্ধ-লড়াই এর তুফান বয়ে চলছিল। (তাঁর জীবনী গ্রন্থাবলী দ্র:)

এই তুফানেই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ধর্মীয় দাওয়াত আত্মপ্রকাশ লাভ করে। লোকেরা তাঁর সাথেও অনুরূপ আচরণে মিলিত হয়, কিন্তু তিনি তা ভিন্ন পন্থায় জবাব দেন। মাত্র আট বছরে ফলাফল এই দাঁড়াল যে, যারা শত বছর, ও ৪০ বছর ধরে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল তারা পরস্পরে এমন ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হয়ে গেল, প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্থানে স্বীয় আত্মত্যাগকে গর্বের বিষয় মনে করতে লাগল। যেখানে ব্যবসায়ী কাফেলা মরু পথে চলা অবস্থায় লুটপাট হয়ে যেত, সেখানে উটের পৃষ্ঠে আরোহী মহিলা হাজারো মাইল পথ একাকী অতিক্রম করলেও বাঁকা নজরে তাকানোর কেউ থাকত না।

মূল কথা: সমস্ত পয়গাম্বর, পুরোহিত ও ঋষিদের পূর্ণ ইতিহাসে এ ধরনের শান্তি প্রতিষ্ঠার নজির আর নেই। অতএব তিনিই হলেন এ পূর্বাভাসের মূর্ত প্রতীক।

এই মন্ত্রের শেষ পংক্তিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার শত্রুদের থেকে রক্ষা করবেন, যে শত্রুর সংখ্যা হবে ৬০ হাজার ৯০ জন।

এখানে তার শত্রু সংখ্যা এমন সুক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা হয়েছে যে, যার কারণে এ ভবিষ্যদ্বাণী-পূর্বাভাসটি অতি মহান ও অতি চমৎকার। এখানে শত্রুর উদ্দেশ্য হলো, যারা আত্মার শত্রু, যারা তরবারী নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল,

এমনকি গোপনে গোপনে তারা তাঁকে হত্যারও ষড়যন্ত্র করেছিল। অতএব, এদের হাতেই তাঁর জানের ভয় ছিল, তাই এ ধরনের শত্রু থেকেই আল্লাহ তাঁকে সংরক্ষণ করেন এবং এরই সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার ৯০ জন। এ সংখ্যার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ: মক্কার কুরাইশ গোত্র এবং তাদের সহযোগী গাতফান গোষ্ঠী ও তাদের অংশীদার মিলেছিল ১০ হাজার যারা সবাই মিলে পরিখার যুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল। এমনিভাবে ইয়াহুদীদের বিভিন্ন গোত্র মিলে তাদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার যারা খায়বার যুদ্ধে প্রায় সম্মিলিত লড়াই করে, আর অন্যান্য যুদ্ধে পৃথক পৃথক অংশ গ্রহণ করে। রোমান বাহিনী যাদের মুকাবেলা করার জন্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবুক গমন করেন কিন্তু তারা সামনে আসেনি, এদের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার এ মিলে সর্বমোট ৬০ হাজার হল। তাবুক যাত্রার প্রাক্কালে কিছু সংখ্যক মুনাফিক (দ্বিমুখী নীতির লোক) তাঁর সাথে যেতে অস্বীকার করে তাদের সংখ্যা ছিল ৮০জন, কিন্তু মুনাফিকদের মধ্যে অন্য ১২/১৩ জন তাবুক গমন করে কিন্তু তাবুক থেকে ফিরার পথে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে যা ফলপ্রসূ হয়নি, তাদের দুজন ছিল দ্বিধাগ্রস্থ অত:পর তাওবা করে নেয়, আর ১০জন আপন অবস্থায় বাকী

থাকে। এভাবে তার শত্রুর সংখ্যা ৬০ হাজার ৯০জন হয়, যার মধ্যে আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করেন।

আলোচ্য মন্ত্রের একাংশে "রুশমেষু" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি যেমন শত্রু অর্থে ব্যবহৃত হয় তেমনি আরব দ্বীপের অধিবাসী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তবে এখানে যদি দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে অবশ্য 'নরাশন্স" পয়গাম্বরের সম্পর্ক যে আরব দ্বীপের সাথে হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায়। আর একথাও সর্বজনবিদিত যে আরব দ্বীপ থেকে একমাত্র মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাবী- পয়গাম্বর হিসেবে আবির্ভূত হন। (বিস্তারিত দেখুন: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিন্দু কিতাবুঁ মে)

অথর্ববেদের ২০মত কান্ডে, নবম অনুবাক একত্রিংশ সুক্তের সপ্তম মন্ত্রে ৪৭৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

রাজ্ঞো বিশ্বজনীনস্য যো দেবোহমর্ত্যাঁ অতি।

বৈশ্বানরস্য সুষ্ঠুতিমা সুনোতা পরিক্ষিত।

বঙ্গানুবাদ: "তিনি তো পৃথিবী সম্রাট ও দেবতা, সর্বোত্তম মানব, সমস্ত মানবতার দিশারী, সকল জাতির নিকট সুপরিচিত, তাঁর সর্বোচ্চ প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা কর"।

এই মন্ত্রটি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কতিপয় গুণাবলী সংশ্লিষ্ট। এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

তাঁকে পৃথিবী সম্রাট বলা হয়েছে: হাদীস শাস্ত্রেও এসেছে যে, তিনি আদম সন্তানের সরদার যেমন তাঁর বাণী " আমি আদম সন্তানের সরদার- নেতা এতে কোন গর্ব নেই" বিশুদ্ধ হাদীস, হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থদ্বয়ে। এছাড়া তিনি বলেন:"... আমি ব্যাপকভাবে সকল মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছি" হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম সর্ববিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে সমস্ত মানুষকে জানিয়ে দেয়ার জন্য বলেন:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

(سورة الأعراف:١٥٨)

অর্থ: (হে মুহাম্মাদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি ঘোষণা করে দাও হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল- দূত রূপে প্রেরিত হয়েছি...। (সূরা আরাফ: ১৫৮) অর্থাৎ, অন্যান্য নাবী বা রাসূলের মত নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠী কেন্দ্রিক নই।

অতএব, পৃথিবীতে তিনি যে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন তা অন্য আর কেউ অর্জন করেননি। পরকালেও

আদমসহ সমস্ত নাবী (আলাইহিমুস সালাম) তার পতাকা তলে সমবেত হবেন।

মন্ত্রে তাকে দেবতা ও সর্বোত্তম মানুষ অভিহিত করা হয়েছে। আর প্রকৃতই তিনি এমন পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ফেরেশ্‌তা বা স্বর্গীয় দূত তুল্য ছিলেন।

তাঁকে সমস্ত মানবতার পথ নির্দেশক বলা হয়েছে। একথাও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্যই নির্ধারিত, কেননা তাঁকে সারা পৃথিবীর জন্য পয়গাম্বর-বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে, তিনি ব্যতীত অন্যান্য পয়গাম্বর ও বার্তাবাহকগণ নির্ধারিত জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন।

তাঁকে সকল জাতির নিকট সুপরিচিত বলা হয়েছে, এর এক অর্থ এমন হতে পারে যে, তাঁর সম্পর্কে পূর্বাভাস ও শুভ সংবাদ প্রত্যেক জাতির নিকট থাকবে, এই জন্য প্রত্যেক জাতিই তাঁর সম্পর্কে জানবে, তাঁর অপেক্ষায় থাকবে, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই তাঁর আগমনের পূর্বাভাস রয়েছে, আর তাঁর শুভাগমনের পর তাদের বিশেষজ্ঞ ও পুরোহিতগণও তাকে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু তার মধ্যে কতিপয় তো তার প্রতি ঈমান আনেন, আর

কতিপয় স্বীয় পার্থিব উদ্দেশ্যে ও সমাজে স্বীয় মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য তাঁকে অস্বীকার করেন।

এই মন্ত্রের সর্বশেষে বলা হয়েছে যে, "তাঁর সর্বোত্তম প্রশংসা ও গুণগান গাও"। এর শাব্দিক অর্থে বুঝা যায় যে, তাঁর প্রশংসার আদেশ করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর খবর দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ মানুষ তাঁর সর্বোত্তম প্রশংসা করবে, আর প্রকৃত পক্ষেই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এত অধিক প্রশংসা করা হয়েছে যে, কোন জাতি স্বীয় পয়গাম্বর-পুরোহিতের এ ধরনের প্রশংসা গুণগান করেনি। আর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেও তার প্রশংসা ও স্তুতি গাওয়ার আদেশ রয়েছে।

প্রিয় পাঠক! এ যাবৎ বেদ চতুষ্টয়ের চতুর্থ বেদ অথর্ব বেদের ২০তম কান্ডের নবম আনুবাক, ৩১তম সুক্তের ১৪ মন্ত্রের মাত্র ১ম ও সপ্তম মন্ত্রের আলোচনা করা হলো। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর গুণগান সম্পর্কে উক্ত কান্ডের অবশিষ্ট ১২ মন্ত্রে ও ঋগ্ব বেদে আরো বহু কথা রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় উক্ত অবশিষ্ট মন্ত্রগুলির সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো। বিস্ত ারিত জানার আগ্রহী পাঠকের জন্য উক্ত বেদের ৪৭২ পৃ: থেকে ৪৭৩ পৃ: বা ইবনে আকবার আজমী রচিত 'মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিন্দু কিতাবু মেঁ' নামক বইটি পড়ার পরামর্শ রইল।

অথর্ব বেদের ২০তম কান্ডের নবম অনুবাক, ৩১তম সূক্তের অবশিষ্ট মন্ত্রের বর্ণনার সারসংক্ষেপ পড়ুন এবং বিবেচনা করুন যে, এ সব মন্ত্রের বাণীগুলিও কিভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর প্রযোজ্য হয়।

১। তাকে "রবীহ" বলে সম্বোধন করা হয়েছে আর এর অর্থ হলো: "আহমাদ" আর তাঁর নাম যে "আহমাদ" তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

২। তিনি অতি সুদর্শন হবেন। তাঁর জীবন-চরিতে সে কথা স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে।

৩। মহা পথনির্দেশক পূত-পবিত্র রাসূল (বার্তাবাহক) সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং পৃথিবীর সরদার ও নেতা হবেন। তার পয়গাম্বরী সমস্ত মানবতার জন্য।

৪। মানুষদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করবেন।

৫। মহান আল্লাহ তাঁকে অদৃশ্যের খবর জানাবেন আর তিনি মানুষদেরকে তার খবর দিবেন।

৬। তাঁর যাতায়াতের বাহন হবে উট। সর্বজন বিদিত যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাহন ছিল উট, আর সে যুগও অতিক্রম হয়ে গেছে, পরবর্তীতে সেরূপযুগ আসার সম্ভাবনা নেই।

৭। তাঁর ১২ জন স্ত্রী হবে। পয়গাম্বর, ঋষি, পুরোহিতদের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরই ১২জন স্ত্রী ছিল।

৮। তিনি নাস্তিক, জালেম-অন্যায় অত্যাচারী ও পাপাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরনের বহু যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছেন।

৯। তাঁর সহচরবৃন্দ আল্লাহর অধিক প্রশংসাকারী ও নামায আদায়কারী হবে এমন কি যুদ্ধাবস্থায়ও প্রশংসা ও নামায আদায় করবে। এর নজীর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সহচরদের মধ্যেই রয়েছে যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

১০। তাঁদের নারী ও শিশুরা যুদ্ধ চলাকালীন সময় পূর্ণ নিরাপদে সুসংরক্ষিত থাকবে, তাঁর ক্ষেত্রে বাস্তবে ঘটে ছিল তাই।

১১। বায়তুল্লাহ (ক্বাবা ঘর) নির্মাণের সময় তাঁর বড় কর্ম-কৌশল প্রকাশ পাবে যার ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হবে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটে ক্বাবা ঘরে কাল পাথর স্থাপন করার প্রাক্কালে। (তাঁর জীবনী গ্রন্থ দ্রঃ)

১২। বহু ঘর-বাড়ী মূর্তি থেকে পূত-পবিত্র করে সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করার ফলে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে যার ফলে সবাই আনন্দিত হবে। আর এ ঘটনা ঘটে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মক্কা বিজয়ের সময়। (তাঁর জীবনী গ্রন্থাবলী দ্রঃ)

১৩। তিনি অনাথের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী হবেন। হাজার হাজার লোককে দান-খয়রাত করবেন এবং তাঁর যুগের মানুষ সবাই শান্তি লাভ করবে।

১৪। পরিশেষে তাঁর ও তাঁর উম্মতের জন্য রয়েছে শত্রুদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তার দোয়া-আশীর্বাদ। (অথর্ব বেদের উক্ত অংশের ১-১৪ মন্ত্র, ৪৭২-৪৭৩ পৃঃ দ্রঃ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দু কিতাবু মেঁ পৃঃ ৫৬-৫৮)

বেদের উপরোল্লিখিত পূর্বাভাস যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য নির্ধারিত তা নিছক দাবী নয় বরং তা বাস্তবতার স্বীকৃতি ও মানবতার ইতিহাসে দ্বিতীয় আর কারো মধ্যে উক্ত পূর্বাভাসের বাস্তবতার নজীর অবর্তমান। অতএব, উক্ত পূর্বাভাস ও শুভ সংবাদের নির্ধারিত ব্যক্তিত্ব তিনি, আর তা অস্বীকার করার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। তিনি ছাড়া এ ধরনের

ব্যক্তিত্ব ইত:পূর্বে প্রকাশ লাভ করেননি করবেনও না, আর কেউ প্রমাণও করতে পারবে না।

পুরাণে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

পুরাণ হিন্দু ধর্মের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মহাপুরাণ ও উপপুরাণ সর্ব মোট ৩৬টি, তার মধ্যে একটি হল "ভবিষ্য পুরাণ"। (ডঃ বিজন গোস্বামী কৃর্তুক অনুবাদিত ও সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ভাগবত' এর ভূমিকার ১ম পৃষ্ঠা দ্র:) এখানে "ভবিষ্য" এর অর্থ হলো ভবিষ্যদ্বানী বা পূর্বাবাস। যেহেতু এই পুরাণে ভবিষ্যতে ঘটবে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে তাই এর নাম দেয়া হয়েছে "ভবিষ্য পুরাণ"।

হিন্দু গ্রন্থসমূহে 'কল্কী অবতার' (বার্তাবাহক) আগমনের পূর্বাভাস স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এ পূর্বাভাস হিন্দুদের নিকট মহা গুরুত্বপূর্ণ পূর্বাভাস। এই 'কল্কী অবতার' এর শুভাগমনের প্রত্যাশায় হিন্দুরা আজ পর্যন্ত রয়েছে। কিন্তু 'কল্কী অবতার' কেন্দ্রিক ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রমাণ ভবিষ্য পুরাণের বাণী ও তার সাথে এর সম্পর্ক মিল করে তুলে ধরা হলো:

পুরাণে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিতা-মাতার নাম

কল্কী পুরাণ গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ের ১১তম শ্লোকে রয়েছে:
" সুমতী বিষ্ণুযশাসা গর্ভমাধত্ব 'বীষ্ণুওয়ামু' ।"
বঙ্গানুবাদ: অর্থাৎ কল্কী অবতার "সূমতী" এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করবে আর তার পিতার নাম হবে বিষ্ণুযশা।
'সূমতী' এর শাব্দিক অর্থ "আমেনা" 'বিষ্ণুযশা' অর্থ আব্দুল্লাহ (আল্লাহর দাস)। আর সমগ্র বিশ্বই জানে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমেনা। (দেখুন: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিন্দু কিতাবু মেঁ পৃ: ৬২) পূরাণের অন্য অংশেও এ নাম উল্লেখ রয়েছে। যেমন উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ৫ম পৃষ্ঠায় রয়েছে: "জগৎ পালক শ্রীভগবান কল্কি নাম ধারণ করিয়া বিষ্ণুযশা: নামক ব্রাহ্মণের পুত্র রূপে অবতীর্ণ হইবেন"

পুরাণে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্মস্থান ও বংশধর

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের ১২তম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ের ১৮তম শ্লোক ৮০২পৃষ্ঠায় এবং কল্কী পুরাণের ২য় অধ্যায়ে

৪র্থ শ্লোকে শ্রেণীমত এসেছে: "সেই ভগবান কল্কি শাম্ভল গ্রামের প্রধান বিপ্র মহাত্মা বিষ্ণুযশার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন"।

প্রিয় পাঠক! এখন উক্ত শ্লোকগুলিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রতি লক্ষ্য করুন:

শম্ভল এর অর্থ হল নিরাপদ বা শান্তিময় এবং গ্রাম এর অর্থ হল গ্রাম- মহল্লা। অতএব শম্ভল গ্রাম এর অর্থ দাঁড়াল নিরাপদ গ্রাম। আর সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এ নাম ও এগুণ শুধু মক্কার। এ জন্য কুরআনে একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে وهذا البلد الأمين অর্থ: এবং শপথ এই নিরাপদ বা শান্তিময় নগরীর। (আল কুরআন, সূরা ত্বীন, ৩নং আয়াত) কুরআনে অন্যান্য স্থানেও মক্কাকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সুতরাং মক্কা এমন এক নিরাপদ-শান্তিময় গ্রাম বা নগরী সেখানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্মের পূর্বে বর্বর ও অন্ধকার যুগেও যখন মানুষ মানুষকে অতি নগন্য কারণেও একে অপরের গলা কেটে ফেলত কিন্তু কেউ যদি এখানে পিতার হত্যাকারীকেও পেয়ে যেত তাকে "উহ" শব্দ পর্যন্ত করত না। (শান্তি-নিরাপত্তা বজায়ের খাতিরে।)

"বিষ্ণু" হিন্দুদের নিকট প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর নাম। এক পর্যায়ে তারা সে নামে একজন দেবতা মানা শুরু করে। "যশা" এর অর্থ বান্দা বা দাস। সুতরাং বীষ্ণুযশার অর্থ দাঁড়াল আল্লাহর বান্দা বা দাস যাকে আরবীতে আব্দুল্লাহ বলা হয়। আর এই আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিতা।

"বিপ্র মহাত্মা" ধর্মীয় নেতাকে বলা হয়। মক্কার ধর্মীয় নেতা সে সময় প্রথমে হাশেম ছিলেন, তারপর ক্রমান্বয়ে আব্দুল মুত্তালেব ছিলেন। আর আব্দুল মুত্তালেব এর নেতৃত্বের যুগে তার গৃহে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহর ঔরসে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্ম গ্রহণ করেন।

অতএব, নিরপেক্ষ পাঠক! ভেবে দেখুন উক্ত শ্লোকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিতা-মাতা, বংশ ও স্থানের কিভাবে বাস্তবচিত্র অংকিত হয়েছে। (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দু কিতাবূ মেঁ পৃ: ৬৩)

বেদ ও পুরাণে তাঁর আবির্ভাব কাল

অথর্ব বেদের ২০তম কান্ড নবম অনুবাক ৩১তম সুক্তের ২য় মন্ত্রে, ৪৭২-৪৭৩ পৃঃ তার সওয়ারী (বাহন) যে উট হবে তা উল্লেখ রয়েছে। তেমনি কল্কী পুরাণের দ্বিতীয়

অধ্যায়ে রয়েছে, কল্কী অবতার ঘোড়া ও উটে আরোহন করবেন এবং তার নিকট তরবারী থাকবে, যার মাধ্যমে তিনি ধর্মের শত্রুদেরকে ধ্বংশ করবেন। এছাড়াও শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮০২ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

"অতুলনীয় কান্তি অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্যযুক্ত জগৎপতি কল্কি অসজনবিমর্দী দেবদত্ত নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া আগমন করিবেন এবং সেই শীঘ্রগামী অশ্বে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া কপট রাজবেশধারী দস্যুগণকে আঘাতে বধ করিবেন।"

এর অর্থ: কল্কী অবতার এমন যুগে আগমন করবেন যখন যানবাহনের জন্য ঘোড়া ও উট ব্যবহৃত হবে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে তরবারী। আর তা স্পষ্ট যে এ যুগ বেশ পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে, ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে যে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পয়গাম্বর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এ সবের প্রচলন ছিল তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বর্তমান যুগ ঘোড়া ও উটের পরিবর্তে, মোটরযান, রেলগাড়ী ও উড়োজাহাজের যুগ এবং তরবারীর স্থানে তোপ, গোলাবারুদ, ট্যাঙ্ক, ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমানবিক অস্ত্রের যুগ। অতএব, বর্তমান যুগে বা ভবিষ্যতেও কল্কী

অবতারের শুভাগমনের অপেক্ষা সুদূর পরাহত। বরং এই কল্কী অবতারকে অতীত কালের ইতিহাসে খোঁজ করতে হবে এবং এসব গ্রন্থে বর্ণিত ও তার বাস্তব চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য তার আলোকে তা নির্ধারণ করতে হবে। আর এটিও ভুললে চলবে না যে তিনি ঘোড়া, উট ও তরবারীর যুগেই আবির্ভুত হয়েছিলেন।

পূরাণে তাঁর পিতা-মাতার তিরোধান

শ্রীমদ্ভাগত পুরাণের ১২তম স্কন্ধে বর্ণিত রয়েছে কল্কী অবতারের পিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করবেন। আর তাঁর জন্মের কিছুকাল পরেই তার মাতা মৃত্যুবরণ করবেন। দেখুন: "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিন্দু কিতাবু মেঁ পৃঃ৬৫"

পূরাণের এ বর্ণনাও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে পুরাপুরি মিলে যায়। কেননা তাঁর পিতা তাঁর জন্মের কিছু দিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন এবং মাতা তাঁর জন্মের ৬ বছর পর মৃত্যুবরণ করেন। ইতিহাস যার জলন্ত প্রমাণ। (দেখুন তাঁর জীবনী গ্রন্থাবলী)।

পূরাণে তাঁর মাধ্যমে পয়গাম্বরীর সমাপ্তি

কল্কী অবতারের মাধ্যমেই আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বর ও বার্তাবহের আবির্ভাব পরিসমাপ্ত ঘটেছে। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় ২৫তম শ্লোকে বর্ণিত: "বড় বড় পয়গাম্বর ২৪জন। কল্কী অবতার সর্বশেষ পয়গাম্বর হবেন, যিনি সমস্ত পয়গাম্বরের পরিসমাপ্তিকারী হবেন। দেখুন: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিন্দু কিতাবু মেঁ: পৃঃ৭২।

আর জানা কথা যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত পৃথিবীর বুকে এমন কোন নাবী আসেননি, যে নিজের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম্বরী ও বার্তাবহের পরিসমাপ্তি দাবী করেছেন। আর তাঁর পরে যেই পয়গাম্বরী দাবী করেছে, পরেই প্রমাণিত হয়েছে যে, সে মিথ্যাবাদী ও ভন্ড-দাজ্জাল। অতএব, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একক ব্যক্তিত্ব যিনি নাবীগণের পরিসমাপ্তিকারী।

পুরাণ ও মহাভারতে তাঁর সর্বোত্তম আদর্শ ও বৈশিষ্টের বর্ণনা

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের ১২তম স্কন্ধের ২য় অধ্যায় ৮০২ পৃঃ রয়েছে:

"অতুলনীয় কান্তি অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্যযুক্ত জগৎপতি কল্কি অসজনবিমর্দী দেবদত্ত নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া আগমন করিবেন এবং সেই শীঘ্রগামী অশ্বে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া কপট রাজবেশধারী দস্যুগণকে আঘাতে বধ করিবেন।"

অর্থাৎ, জগৎপতি যিনি অষ্টস্বর্গীয় গুণে গুণান্বিত হবেন, তিনি একটি উড়াল দেয়া দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহণ করে আসবেন এবং যমিনে বিচরণ করে রাজবেশধারী দস্যুগণকে তরবারী দ্বারা দমন করবেন।

অত্র মন্ত্রের মাধ্যমে খবর দেয়া হয়েছে যে, কল্কী অবতার আটটি পূত-পবিত্র স্বর্গীয় বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী হবেন। এখন প্রশ্ন হলো উক্ত আটটি গুণাবলী কি কি? এর বর্ণনা "মহাভারত" গ্রন্থে এভাবে এসেছেঃ

অষ্টো গুণা: পুরুষং দীপয়ন্তি,
প্রজ্ঞা চ কৌলং চ দম: শ্রুতং চ
পরাক্রমশ্চ বহু ভাষিতা চ,
দানং যথা শক্তি কৃতজ্ঞতা চ

নিম্নে উক্ত আটটি গুণাবলীর শ্রেণীমত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলো:

১। প্রজ্ঞাঃ অর্থাৎ অদৃশ্যের মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তার খবর দেয়া।

২। কৌলং বা কুলীনতাঃ উচ্চবংশের সাথে সম্পৃক্ত ও উচ্চ বংশনামার অধিকারী।

৩। দম: ইন্দ্রিয় দমন: স্বীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্বে রাখার ক্ষমতা।

৪। শ্রুতং বা শ্রুতিজ্ঞানঃ (ওহী) আকাশবাণী ও পয়গাম্বরী লাভ।

৫। পরাক্রমঃ শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ হওয়া।

৬। বহুভাশিতাঃ মিতভাষী হওয়া।

৭। দানঃ বদান্যতা।

৮। কৃতজ্ঞতাঃ কৃতজ্ঞহৃদয়। (বিস্তারিত দেখুন: "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিন্দু কিতাবু মেঁ" পৃঃ৭৬ ও মুহাম্মাদ জিয়াউর রহমান আজমী রচিত দিরাসাত ফি ...ওয়া আদয়ানুল হিন্দ পৃ: ৭১৭-৭২৪)

উল্লেখিত আটটি স্বর্গীয় মহৎগুণ হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস মতে কল্কী অবতারের মধ্যে পাওয়া যাবে। এখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে উক্ত গুণাবলীর সমন্বয় করা যায়ঃ

১। অদৃশ্যের জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তার খবর দেয়া

কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত যে, মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গায়েব- অদৃশ্যের বহু খবর দিয়েছেন যা তিনি তাঁর সাহাবা- সহচরদেরকে জানিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপঃ আকাশ মন্ডল, ভূমন্ডল, তারকারাজি, পাহাড়-পর্বত, স্বর্গীয় দূত (ফেরেশ্তা), মানুষ ও জ্বিন-ভুত, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্বে যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন ও যাদেরকে ধ্বংস করেছেন যেমনঃ আদ, সামূদ, ফিরআউন, নমরূদ ও কারূন প্রমূখ।

অনুরূপ ভবিষ্যতে ঘটবে এ ধরনের খবর যার কতিপয় তাঁর জীবদ্দশায় ঘটেছে, কতগুলি তার তিরোধানের পরপরই কতগুলি তার কিছু কাল পর এবং কতগুলি এখনও সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। যেমনঃ রোম ও পারস্যের উপর বিজয় লাভ, মক্কার মুশরিক কাফেরদের উপর বিজয়, তেমনি ইয়ামেন, সিরিয়া, মিসর, ইরাক প্রভৃতির উপর বিজয় লাভের খবর। মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসার (আলাইহিস সালাম) আত্ম- প্রকাশ, দাজ্জালের হত্যা, কিয়ামত বা মহাপ্রলয় ও পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বের ছোট-বড় বহু নিদর্শন। এগুলির এবং এ ধরনের বহু সংবাদ আল্লাহ

তাকে দিয়েছেন আর তিনি তা উম্মতকে অবহিত করে গেছেন। এ ক্ষেত্রে পাঠকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এ সবের খবর তাঁর অবগত হওয়া আর তা অন্যকে জানানো, তার গায়েবের (অদৃশ্যের) খবর রাখা বা তিনি গায়েব জানেন তা প্রমাণ করে না, কেননা এগুলি সব মহান আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন তিনি আল্লাহ থেকে জানার পর এ মর্মে খবর দিয়েছেন। অতএব, একজন জানানোর পরে সেটি আর গায়েব থাকে না।

২। উচ্চ বংশীয়

কুরাইশ ছিল আরবের সবচেয়ে উচ্চ বংশ, আর বনু হাশেম (হাশেম গোষ্ঠী) উক্ত বংশের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ছিল, আর এই গোষ্ঠী-পরিবারের সাথেই তাঁর সম্পর্ক। হাদীস শরীফে এসেছে তিনি বলেন: আল্লাহ ইব্‌রাহীমের সন্তানের মধ্যে বেছে নেন ইসমাঈলকে এবং ইসমাঈলের বংশধরের মধ্যে বেছে নেন কেনানা গোষ্ঠীকে, আর কেনানা থেকে বাছাই করেন কোরাইশ বংশকে আর কোরাইশ থেকে চয়ন করেন হাশেম গোষ্ঠীকে আর আমাকে চয়ন করেন হাশেম গোষ্ঠী থেকে (মুসলিম শরীফ)

৩। প্রবৃত্তিদমন

এ চরিত্রের নীতিই হলো, মানুষ যাবতীয় অপছন্দনীয় ও অশ্লীল কথা ও কর্ম থেকে দূরে থাকবে, প্রবৃত্তি ও ধন সম্পদের ক্ষেত্রে পূত-পবিত্র হবে, শত্রুদের বিরুদ্ধে সুযোগ পেয়েও প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে মাফ করে দিবে এবং দুষ্কর্ম, ঝগড়ার উন্মুক্ত পরিবেশ থাকা সত্বেও তা পরিত্যাগ করে উত্তম চরিত্র গ্রহণ করবে।

সম্মানিত পাঠক! এখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তিনি তাঁর প্রবৃত্তি ও চাহিদাকে সব থেকে বেশী আয়ত্বে রাখতেন। তাঁর সমাজে উস্‌কানি ও সুড়সুড়ি জাগানো সব ধরনের পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল, কোথাও কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না, কিন্তু তিনি কোন অন্যায় কর্মের নিকটবর্তী হননি। তাঁকে কত কষ্ট দেয়া হয়েছে, তারপর তিনি প্রতিশোধ নেয়ার পুরাপরি সামর্থ ও সুযোগও পেয়েছেন কিন্ত তিনি নিজ সত্ত্বার জন্য কারো নিকট থেকে কোন প্রতিশোধ নেননি। তিনি পূত-পবিত্রতার সর্বোচ্চ স্থানে আসীন ছিলেন। সব ধরনের অন্যায় এমনকি সন্দেহযুক্ত কথা, কর্ম ও সম্পদ থেকে বহু দূরে থাকতেন। তাঁর অনুসারীদেরকেও এর শিক্ষা দিতেন।

তিনি বলেন: বাহাদুর তো ঐ ব্যক্তি নয়, যে অন্যকে পরস্থ করে, বরং বাহাদুর ঐ ব্যক্তি যে রাগের অবস্থায় নিজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)
তিনি আরো বলেন: "যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দুই চোয়াল ও দুই উরু-রানের মধ্যবর্তী অঙ্গ (অর্থাৎ মুখ ও লজ্জাস্থানের) সংরক্ষণের জামিন হলো আমি তার জান্নাতের জামিন হলাম।" (আল হাদীস, বুখারী)

৪। পয়গাম্বরী লাভ ও আকাশবাণী প্রাপ্তি

এ বিষয়ে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না, কেননা পূর্ণ কুরআনই তার প্রমাণ। আর তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলেন না। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (سورة النجم:٣-٤)

অর্থাৎ আর না তিনি স্বীয় প্রবৃত্তিবশত: কোন কথা বলেন, তা তো নিছক অহী যা প্রত্যাদেশ করা হয় (আল কুরআন সূরা নাজ্‌ম আয়াত:৩-৪)
আল্লাহ আরো বলেন:

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ (سورة الحاقة:٤٤-٤٥)

অর্থাৎ সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতো তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। (সূরা হাক্কাহ্ আয়াত:৪৪-৪৫)

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾

(سورة الشورى:٧)

অর্থাৎ এভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে..। (সূরা শূরা আয়াত:৭)

৫। বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ গুণেও একক ছিলেন।

তাঁর যুগে মক্কার আবদ ইয়াযীদের পুত্র রুকানা একমাত্র বাহাদুর ছিলেন, কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত না। একবার বাহাদুর রুকানা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চ্যালেঞ্জ করে বসল যে, মুহাম্মাদ যদি আমাকে লড়াইয়ে পাছড়িয়ে দিতে পারে তবে আমি মুসলমান হয়ে যাব। তিনি তাকে একবার নয় তিনবার পরাজিত করেন, তারপর রুকানা মুসলমান হয়ে যায়। (বিস্তারিত দেখুন: ইবনে

কাসীরের বিদায়া ওয়া নিহায়া ২/১১২ ও আবু দাউদ ৪/৩৪০-৩৪১ তিরমিযী ৪/২৪৭-২৪৮)

৬। মিতভাষী

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত কম কথা বলতেন বহুক্ষণ চুপ থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কোন কথা বলতেন না। (কাজী ইয়াজের শিফা গ্রন্থ দ্রঃ ১/১৭৭) তিনি তাঁর সাহাবা-অনুসারীদেরকে কম কথা বলার শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন: কম কথা বলা (নিরর্থক কথা পরিত্যাগ করা) মানুষের ইসলামী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। আল হাদীস, মুসনাদে আহমাদ ১/২০১। তিনি আরো বলেন: আমি আবির্ভূত হয়েছি সুসংক্ষিপ্ত ও মর্মসমৃদ্ধ বাণীসহ..। (বুখারী) অর্থাৎ তিনি ব্যাপক অর্থবোধক অল্প কথা বলতেন।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রখ্যাত সাহাবী ও সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী আবূ হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনায় এসেছে: (তিনি বলেন:)

(بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب)

অর্থাৎ আমি আবির্ভূত হয়েছি সুসংক্ষিপ্ত অধিক অর্থ সমৃদ্ধ কথাসহ এবং আমি সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছি (শত্রু হৃদয়ে) সমীহমিশ্রিত ভীতির উদ্রেক হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। (অর্থাৎ

তাঁর নাম বা আগমন বার্তা শুনা মাত্রই শত্রুদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার হওয়ার মাধ্যমে। (মুসলিম শরীফ)

তিনি আরো বলেন: আল্লাহর যিকর-স্মরণ (জপ) ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বল না। কেননা আল্লাহর যিকর ব্যতীত অতিরিক্ত কথা হৃদয় কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণ। (আল হাদীস, তিরমিযী)

৭। দানশীলতা ও বদান্যতা

এই গুণেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত মানুষ থেকে উত্তম ছিলেন। তাঁর দানশীলতা ও হৃদয়ের গভীরতার এমন অবস্থা ছিল যে, সমস্ত মানবতার ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। যা কিছু তার নিকট জমা হতো, সমুদয় বিতরণ করে দিতেন আর বলতেন: "যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমি পেয়ে যাই, তবে আমার সহ্য হবে না যে তিন দিন অতিবাহিত হয়ে যাক, আর তার মধ্যে আমার নিকট কিছু অবশিষ্ট থাকুক। আর যদিও অবশিষ্ট থাকে তা যেন শুধু ঋণ পরিশোধের জন্যই হয়।" (আল হাদীস, বুখারী)

তাঁর প্রখ্যাত সাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট কখনোও এমন কিছু চাওয়া হয়নি যে তিনি বলেছেন, না। (বুখারী)
অর্থাৎ তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করা হলে তিনি কখনও না, বলতেন না।
সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন: নাবী (মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যতের জন্য কোন কিছু জমা রাখতেন না। (তিরমিজী: ২৩৬২ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ ও মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে)।

৮। কৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাঁর পূর্ব-পশ্চাতের পাপ ক্ষমা করা সত্ত্বেও তিনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বেশী-বেশী ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, তাঁর প্রখ্যাত সাহাবী-সহচর মুগীরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাণী, নাবী (মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্য এমনি ইবাদত, (উপাসনা) বা নামায আদায় করতেন যে, এর ফলে তার দুই পা অথবা দু পায়ের গোছা ফুলে যেত। অত:পর তাঁকে (এ ব্যাপারে) বলা হলে তিনি জবাব দিতেন: আমি কি একজন কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা-দাস হব না?। (বুখারী, হাদীস নং: ১১৩০-৬৪৭১)

প্রিয় পাঠক! হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে কল্কী অবতারের যে আল্লাহ প্রদত্ত আটটি স্বর্গীয় মহাগুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে এবং তা ব্যতীত অবশিষ্ট যে সব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কথা ঐ সমস্ত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাঝে উত্তম রূপেই বিদ্যমান। অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, উক্ত অবতারের উল্লিখিত বাণী দ্বারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্দেশ্য অর্থাৎ সমস্ত গুণাবলীর তিনিই মূর্ত প্রতীক। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (سورة القلم: ٤)

অর্থাৎ তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা কালাম আয়াত:৪)

হিন্দু সমাজের প্রতি উদাত্ত আহবান

কল্কী অবতার সম্পর্কিত হিন্দু গ্রন্থাবলীতে যে বিস্তারিত ও স্পষ্ট পূর্বাভাস বর্ণিত হয়েছে তা থেকে এখানে শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপ অতি সামান্যই বর্ণিত হয়েছে, আপনি সেগুলি বা এখানে উল্লিখিত পূর্বাভাসগুলি বারবার পড়ুন, অত্যন্ত মনোযোগসহ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়ুন এবং ভেবে দেখুন,

কল্কী অবতার থেকে উদ্দেশ্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিত্ব কি হতে পারে? উল্লেখিত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সাথে কি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া অন্য কারো মিল রয়েছে? এখন পর্যন্ত কি হিন্দুদের জন্য তাঁর অপেক্ষায় বসে থাকার সুযোগ রয়েছে? অত:পর আপনি যদি হিন্দু হয়ে থাকেন, তবে কেন ঐ মহা সত্য গ্রহণ করতে পিছপা রয়েছেন? যে মহা সত্যকে আপনার ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, আর সে গ্রন্থাবলীর প্রতি যদি আপনার বিশ্বাস থেকে থাকে? তবে এই মহা সত্যকে অস্বীকার করে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী অতি সামান্য স্বার্থের জন্য ভবিষ্যতের অনন্ত কালীন ও অতি উত্তম জগতের ক্ষতি সাধন করার কতটুকু যৌক্তিকতা রয়েছে?

ভবিষ্য পুরাণে মাহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে সুসংবাদ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিন্দু ধর্মে মহাপুরাণ ও উপপুরাণ মিলে মোট ৩৬টি পুরাণ গ্রন্থ রয়েছে যার মধ্যে একটি ভবিষ্য পুরাণ। এর মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যতে ঘটবে সে ঘটনার পূর্বাভাস। এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ, তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সরগে যা পূর্তী সরগ নামে পরিচিত, তার মধ্যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে

স্পষ্ট পূর্বাভাস রয়েছে যা বেদ প্রণেতা মহাঋষি ভিয়াসের কাশ্‌ফের (অন্তর্দৃষ্টি উম্মোচন) উপর ভিত্তি। এই কাশ্‌ফে তিনি স্বয়ং কিছু দেখেন আর কিছু হিন্দু বিশ্বাস মতে ফেরেশ্‌তার (স্বর্গীয় দূত) মাধ্যমে শুনেছেন। এই সরগের ৫-৮ মন্ত্রে রয়েছে।

অর্থাৎ (বেদ প্রণেতা মহাঋষি ভিয়াস বলেন:) "আমি হঠাৎ করে কি দেখছি? দেখছি যে, এক অনার্য আধ্যাত্মিক গুরু যিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে পরিচিত, স্বীয় সাহাবা-সংগীদের সাথে আসলেন। ঐ আরবের অধিবাসী পবিত্র মহা মানবের (একনিষ্ঠ হৃদয়ে) সম্মানের উদ্দেশ্যে রাজাভূজ আবির্ভূত হলেন এবং গংগার পানি ও পঞ্চপাককারী বস্তুর মাধ্যমে তাকে গোসল (স্নান) দিলেন, ইতি পূর্বে তাঁকে সুগন্ধি বস্তু ও অন্যান্য জিনিস উপঢৌকন দেন। তারপর তাঁকে রাজাভুজ বলেন, আপনার উপর সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক, হে মানব জাতির গর্ব! হে আরব ভূখন্ডের অধিবাসী! এবং হে শয়তানকে বিতাড়িত করার ক্ষমতা প্রদর্শনকারী।"

উল্লেখিত মন্ত্রগুলিতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট শুভসংবাদ রয়েছে। এখানে কোন অপব্যাখ্যার সুযোগ নেই। কেননা এগুলিতে যা বলা হয়েছে তা অন্য কারো সাথে মিলানো সম্ভব নয়।

মন্ত্রগুলি স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সর্বশ্রেণীর পাঠকমন্ডলীর সুবিধার্থে সংক্ষেপে তার ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো:

এখানে প্রথম মন্ত্রে মুহাম্মাদ নাম বলা হয়েছে, আর এ নাম পয়গাম্বর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কোন নাবী-পয়গাম্বর, ঋষি বা পুরোহিতের নয়, যা সমগ্র বিশ্ব অবহিত রয়েছে।

মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, তিনি অনার্য হবেন, আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন না। এর ফলে তাঁর ভারতবর্ষেও আবির্ভুত না হওয়া অবশ্যম্ভাবী হলো।

মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, তিনি আরব দেশের অধিবাসী হবেন। আর আরব দেশ থেকে তিনিই একমাত্র পয়গাম্বর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে আবির্ভূত হয়েছেন।

এখানে তাঁর এগুণও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি গঙ্গাপানি এবং হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী পঞ্চপবিত্রকরণ বস্তু দ্বারা পবিত্রকৃত হবেন। হিন্দু শাস্ত্র মতে কেউ যদি গংগার পানিতে গোসল (স্নান) করে নেয় তবে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। যেহেতু আরব দেশে গংগা নেই তাই এখানে রূপক অর্থ বুঝায়, অর্থাৎ তিনি পাপসমূহ থেকে এমন পূত পবিত্র হবেন, যেমন কেউ গংগাতে

গোসল-স্নান করলে পূত-পবিত্র হয়ে থাকে। আর তিনিই একক ব্যক্তিত্ব যিনি সব ধরনের পাপ ও দোষত্রুটি মুক্ত ছিলেন।

মন্ত্রে এ বৈশিষ্ট্য ও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মানব জাতির গর্ব হবেন। সত্যই পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি সর্বোত্তম চরিত্রের এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, তাঁর তুলনা পৃথিবী উপস্থিত করতে অপারগ। (দেখুনঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দু কিতাবূ মেঁ)

একটি চমৎকার ঘটনা

আধ্যাত্মিক গুরুর সাথে রাজাভূজের ঘটনা এ মন্ত্রগুলির চমকপ্রদ ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ভূজ ভারতের এক রাজার নাম, যার নামানুসারে গুজরাটের এক শহরের নাম ভূজ যা আজও বিদ্যমান। (এ ভূজেই ঘটে গেল ২০০১ সালে মহা ভুমিকম্প, এবং এখানেই ঘটে গেল সেখানকার হিন্দুকর্তৃক মুসলমানদের উপর অমানবিক, হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞ।) রাজাভূজের ঘটনার নিম্নরূপ বর্ণনা দেয়া হয়ঃ তিনি (রাজা ভূজ) গুজরাটের কিছু অংশের শাসক ছিলেন, তিনি এক রাত্রিতে দেখেন যে, চন্দ্র দুটুকরা হয়ে রয়েছে, (তা দেখে) তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত হলেন। তিনি পণ্ডিতদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা বেদ ও পুরাণসমূহ

গবেষণা করে উত্তর দিলেন যে, এহল সর্বশেষ নাবী-পয়গাম্বরের মোজেযা-অলৌকিকত্ব। (অলৌকিকত্ব: নাবী-পয়গাম্বর ও বার্তাবাহক কর্তৃক অস্বাভাবিক বিষয় যা সাধারণ লোকের ক্ষমতার বাইরে) অত:পর ভূজ তাদের নিকট শেষ নাবী-পয়গাম্বরের নিদর্শন-চিহ্ন জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন: তিনি নিরাপদ নগরের এক স্থানে ধর্মীয় নেতার বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করবেন। তাঁর নাম নরাশংস (মুহাম্মাদ) হবে, তাঁর চার খলীফা-প্রতিনিধি হবেন। ১২জন স্ত্রী হবেন। এরপর রাজা ভুজ নরাশংস এর সন্ধান শুরু করে দিলেন। পরিশেষে জানতে পারলেন যে তিনি মক্কা ও মদীনায় আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি প্রাসাদে এসে বললেন, সে নরাশংস (মুহাম্মাদ) এর ধর্ম গ্রহণ করেছে। প্রাসাদের লোক সবাই অসন্তুষ্ট হল, যার ফলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাণীসহ বনবাস দিল। রাজা এমতাবস্থায় নরাশংস (মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্মরণ করত: তাঁর প্রভুর ইবাদত করে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে দিল।

উক্ত ঘটনাটি বানারসের ডঃ কমলা কান্ত তেওয়ারী প্রণীত হিন্দি বই "কালিযুগ কে আন্তিম ঋষি" এর ৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে। তিনি তা পণ্ডিত ধর্ম বেদ উপাধ্যায় এর "অন্তিম ঈশ্বরদূত" গ্রন্থের ৯৭ পৃষ্ঠায় দরিয়াগঞ্জ দিল্লী ১৯২৭ খৃঃ ছাপার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। (দেখুন: মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিন্দু কিতাবু মেঁ পৃঃ ১০১-১০৪)

হিন্দু গ্রন্থাবলীতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাম ও উপাধি

পরিশেষে এখানে ঐ সমস্ত নাম ও উপাধি বর্ণনা করতে চাই যা আমাদের জ্ঞানের পরিধি সাপেক্ষে হিন্দু গ্রন্থাবলীতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে এসেছে, অবশ্য এর কিছু বিগত আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে।

১। মুহামাদ, মাহামেদ, মুহাম্মাদ

এগুলি খাঁটি আরবী নাম যা এসেছে, ভবিষ্য পুরাণের পুরতীসারগপ্রত অধ্যায় ৩ ও শ্লোক ৫,১২,১৪ ও১৮তে এবং শ্রীমদ্ভাগবত: মহাতম পুরাণ ২য় অধ্যায় ৭৬তম শ্লোকে এসেছে। (তুলশী দাসের অনুবাদ)

২। মামহ

এ নাম অথর্ব্ব বেদের ২০তম কান্ড নবম: অনুবাক ৩১তম সুক্তমন্ত্র নং ৩ এ ৫৫৬ পৃঃ এবং ঋগবেদে মন্ডল ৫, সুক্ত

২৭ এর প্রথম মন্ত্রে এসেছে এ শব্দটি আরবী মুহাম্মাদের সংস্কৃত বিকৃত রূপ।

৩। নরাশংস

এ শব্দটি বেদে সব চেয়ে বেশী এসেছে। এর বর্ণনা ৫৪/৫৫পৃ: (পূর্বে বিস্তারিত) অতিবাহিত হয়েছে।

৪। অগ্নৈবৈশ্বনর

এ উপাধি ঋগবেদের মন্ডল ৫, সুক্ত ২৭ এর প্রথম মন্ত্রে ৫৫৬ পৃ: এসেছে এর অর্থ হলো: রহমাতুল্লিল আলামীন (জগৎবাসীর জন্য করুনার আধার) আর মুহাম্মাদের এ বৈশিষ্ট্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

৫। অন্তিম কল্কি অবতার

এ উপাধি শ্রীমদ্ভাগবত পুরানের প্রথম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়ের ৫পৃষ্ঠায় এবং অন্যান্য স্থানে এসেছে। অন্তিম এর অর্থ সর্বশেষ এবং অবতার অর্থ পয়গাম্বর ও বার্তাবহ। অতএব, অর্থ দাঁড়ালো: সর্বশেষ নাবী-পয়গাম্বর। কুরআনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে:

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (سورة الأحزاب: ٤٠)

অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রাসূল (বার্তাবহ) এবং শেষ নাবী (পয়গাম্বর) .. (সূরা আহযাব, আয়াত নং ৪০)
অতএব তিনিই সর্বশেষ নাবী ছিলেন।
কল্কী: কলি যুগকে বলা হয়। যে যুগে খারাপী-ঝগড়া ফাসাদ ব্যাপকতা লাভ করবে। এ যুগেই তিনি আবির্ভূত হন।

৬। জগৎপতি বা সর্ব জগৎগুরু

এ উপাধি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের ১২তম খণ্ডের ২য় অধ্যায়ের ৮০২ পৃ: এসেছে। এটি দু'শব্দের সন্ধি, একটি জগৎ যার অর্থ পৃথিবী ২য় পতি যার অর্থ গুরু বা নেতা। অতএব, এর অর্থ হলো: জগৎ গুরু বা বিশ্বনেতা। আর সর্বজন বিদিত যে, মুহাম্মাদই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত মানবতার সরদার।
এ ব্যতীত আরো অনেক নাম ও উপাধি সেসব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। লেখার পরিধি বেড়ে যাওয়ার আশংকায় সংক্ষেপ করা হলো।

ইসলাম ও মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কতিপয় ন্যায়পরায়ণ মহা মনীষীর বাণী

প্রিয় পাঠক! এ প্রসংগে আলোচনার পূর্বে একটি উহ্য প্রশ্নের[১] সংক্ষেপ জবাব উপস্থাপন করে পরে প্রসংগে আসব।

আমাদের সরল সহজ ধর্ম ইসলাম পরিপূর্ণতায় উচ্চ শিখরে এর অন্বেষণকারীর জন্য এরপর আর কোন কিছু নেই। তার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য দিবালোকের চেয়ে স্পষ্ট। একে অন্যান্য ধর্মের উপর বিজয়ী ও উন্নীত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ । যেমন তিনি বলেন:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (سورة التوبة:٣٣)

অর্থাৎ মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার জন্য আল্লাহ্ পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্মসহ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। (আল কুরআন, সূরা তাওবা:৩৩)

[১] . অবশ্য প্রশ্নটি বহু পূর্বে কোন এক বিষয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে আমার নিকটাত্মীয় বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, জনাব নাজীর হোসাইন এম, এ, সাহেব তুলেছিলেন।

অতএব, অমুসলিমদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে আমাদের ধর্মকে শক্তিশালী ও বিজয়ী করার কি প্রয়োজন?

প্রথমত: এদের সাক্ষ্য উল্লেখের মাধ্যমে অমুসলিমদের বিরুদ্ধেই প্রমাণ দাঁড় করানো যে, তা মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে যেন তাদের কোন ওজর-আপত্তি অবশিষ্ট না থাকে।

দ্বিতীয়ত: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়াত-পয়গাম্বরী সম্পর্কে সবাই যেন পরিজ্ঞাত হয় যে, আসমানী গ্রন্থসমূহে তাঁর ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে, আর তারা তাদের যে সব মীনষী ও পুরোহিতদেরকে আদর্শ মনে করে তাঁরাই এ সব বাণীর প্রবক্তা যার ফলে কাফের মুশরিকরা যেন ঈমান-বিশ্বাস আনে আর মুমিনদের ঈমান যেন বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত: তাদের বাণী থেকে সাক্ষ্য গ্রহণের কারণ হলো: যারা গোঁড়ামী বশত: ইসলাম ধর্মের প্রতি কুফরী ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পয়গাম্বরীকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে এগুলো হলো প্রমাণ। কেননা তাদের মীনষী ও পুরোহিতবর্গ ইসলামের আদর্শ ও মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পয়গাম্বরী স্বীকার করে এবং এর ফলে তাদের অনেকে ইসলাম ধর্মকে যথাযথ গবেষণার পর মুহাম্মাদের জীবন-চরিতকে সৃষ্টির সর্বোত্তম ও তাঁর ধর্মীয় বিধি-বিধানকে সর্ব

শ্রেষ্ঠ ও সব বিধিবিধান অপেক্ষা উপযোগী ও উপকারী জ্ঞান করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

প্রিয় পাঠক! ইসলাম ধর্ম, কুরআন ও নাবী সম্পর্কে বিশ্ববরেণ্য অনেক মীনষী ও সংস্থার বহু বাণী রয়েছে এখানে শুধু উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় বাণী উল্লেখ করা হলো:

১। বৃটিশ বিশ্বকোষের ১১তম সংস্করণে লিখা হয়েছে: "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন ধর্মীয় মহা ব্যক্তিত্বদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং ক্ষমতা ও সফলতার ক্ষেত্রে ছিলেন অধিক অগ্রগামী। এই নাবী-পয়গাম্বর এমন মুহুর্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন আরবের অবস্থা ছিল অধ:পতনের অতল তলে, তাদের ধর্মীয় সম্মানজনক কোন শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না, জাতীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক কোন মৌলিক নীতিমালা ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে গর্বের কোন কিছু ছিল না। বহির্বিশ্বের সাথেও তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না এবং তারা ছিল ছিন্ন-ভিন্ন, আপোসে কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রত্যেক স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। আর প্রত্যেক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। ইয়াহুদীরা তাদেরকে পথ নির্দেশনা দিয়ে ব্যর্থ হয়, খৃষ্টানদেরও তাদেরকে সংশোধনের পূর্ব-পর সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায়

পর্যবসিত হয়। কিন্তু নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আগমন করলেন যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সমস্ত জগতের পথ নির্দেশক রূপে। তিনিই কয়েক বছরের মধ্যে আরব উপদ্বীপ থেকে সমস্ত কলহ-বিবাদ ও ভ্রান্ত-বিকৃত স্বভাবের মুলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজাতিকে অধ:পতিত পৌত্তলিকতা থেকে একত্ববাদ-এক আল্লাহর উপাসনার পথে উত্তোলন করেন। যে আরবজাতি বর্বরতায় নিমজ্জিত ছিল, তাদেরকে সত্য ধর্ম ও কুরআনের পথে ফিরিয়ে আনেন। যার ফলে তারা পৌত্তলিক ও ভ্রান্তির স্থলে লাভ করল সত্য-ন্যায় ও সরল পথের দিশা, এমন কি শেষে তারা উন্নীত হল ধার্মিকতায় ও তাপস-দরবেশে। মুসলমানগণ পৌঁছে গেল আত্মমর্যাদার উচ্চ শিখরে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে। সমৃদ্ধ হলো ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে যার সুপ্রভাব তদানিন্তন কালে সমস্ত বিশ্বে বিস্তার লাভ করে, যার আলো সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে যাওয়া অজ্ঞতার অমানিশাকে দূরীভূত করে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। আর নিশ্চয়ই আশ্চর্য হলেও বাস্তব যে, তা পূর্নতা লাভ করেছিল মাত্র ২০ বছরে।

এর শিক্ষা-দিক্ষা ও বিধি-বিধান গ্রহণ ও মানার ক্ষেত্রে সহজ সাধ্য এবং তা সমাজের মানসিক ও সার্বিক যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য উপযোগী...। দক্ষ ও

শ্রেষ্ঠ ডাক্তার তো তিনি নন যিনি দাবী করেন যে, আমি প্রধান ডাক্তার, বরং দক্ষ ও শ্রেষ্ঠ ডাক্তার তো তিনিই, যার মাধ্যমে বহু সংখ্যক মুমূর্ষু রুগী আরোগ্য লাভ করেছে। অনুরূপ সফল সংস্কারক তো তিনিই যিনি বহু সংখ্যক শোচনীয় অবস্থার সফল সংস্কারক। অনুরূপ যে শুধু দাবীই করে যে সে এক নম্বর সংস্কারক সে সফল সংস্কারক নয়, বরং যে, সমস্ত বিশ্ব সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে এবং সমস্ত বিশ্বকে সরল পথের নির্দেশনা দেয়, সেই সফল সংস্কারক। আর এই মহা মানবই তিনি যিনি সফলতা অর্জন করেন সকল সংস্কারক, পথনির্দেশক, বিশিষ্ট পরিণত চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের উপর।"

অত:পর উক্ত বিশ্বকোষে ঐ সমস্ত আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যা অন্যান্য নাবী-রাসূল ব্যতীত একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত, সেগুলি নিম্নরূপ:

১। তাকে জগতে প্রেরণ করা হয় সামগ্রিকভাবে সকলের প্রতি, পক্ষান্তরে তিনি ব্যতীত অন্যদের পয়গাম্বরী (রিসালত) ছিল নির্ধারিত, প্রত্যেক রাসূল-বার্তাবহ ছিলেন নির্দিষ্ট একটি জাতির জন্য। অনুরূপ তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীও ছিল নির্দিষ্ট, প্রত্যেক গ্রন্থই ছিল নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর

জন্য, কিন্তু নাবী মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাত-পয়গাম্বরী ছিল বিশ্বজনীন।[১]

২। তিনিই ছিলেন পূর্ববর্তী রিসালত-পয়গাম্বরীর লক্ষ্য ও বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সুমহান আদর্শ। সুতরাং প্রত্যেক নাবীই ছিলেন বহু আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন একটি আদর্শের নমুনা ও নিদর্শন, কিন্তু নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সকল আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল নমুনা ও নিদর্শন। তিনি সমস্ত মানুষকে মহা চরিত্রের

---

[১] উক্ত বানীর প্রমাণ হলো স্বয়ং আল্লাহর বাণী। যেমনঃ

১।

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (سورة الفرقان: ١)

অর্থাৎ: কত বরকতময় (কল্যাণময়) তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। (সূরা ফুরকান ১ম আয়াত)।

২।

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾(سورة الأعراف: ١٥٨)

অর্থাৎ: হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি ঘোষণা করে দাওঃ হে মানবমন্ডলী আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক ...। (সূরা আরাফ, আয়াত:১৫৯)

৩।

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (سورة الأنبياء: ١٠٧)

অর্থাৎ: আমি তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি শুধু রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত:১০৭)

অধিকারী করে গড়ে তোলার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর তিনিই ছিলেন পূর্ণাঙ্গ মানবতার জন্য সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত।

৩। এ নাবীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি বিশ্ব শান্তির ভিত্তিস্থাপন করেন। তিনি এমন নীতিমালা প্রণয়ন করেননি, যা শুধু সমাজের কিছু লোক তাদের চাহিদা নিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে শান্তিতে জীবন যাপন করবেন, বরং তিনি তাদের সবাইকে শিক্ষা দেন যে সমস্ত জাতি-গোষ্ঠী কিভাবে শান্তি ও সৌহার্দে জীবন যাপন করবে। তিনি কি জগতের বুকে যাঁরা মহা মীনষী রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন? তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মহা বিনয়ের অধিকারী, নিজেকে সমস্ত মানুষের মত সাধারণ মানুষই মনে করতেন

﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي﴾

"বল, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় .." (সূরা কাহফ:১১০) তিনি নিজেকে লোকজনের মধ্যে একজন ব্যক্তিই গণ্য করতেন, তাদের প্রতি নিজের কোন অধিকার জ্ঞান করতেন না, সকলের জন্য (পার্থিব) সমান অধিকার, দায়িত্ব সবার অভিন্ন। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, আরব-অনারব কোন ভেদাভেদ নেই, আর এটিই তো হলো ইসলামের সাম্য।

"(ইসলাম ওয়াল মুসতাশরিকূন।" দেখুন: আহমাদ ইবনে হাজার লিখিত "আল-ইসলাম ওয়ার রাসূল ফি নাযরে মুনসিফিশ শারকে ওয়াল গারব পৃ: ১৩৫-১৩৭।"

২। **বিখ্যাত লেখক ও দার্শনিক বার্নার্ডশ বলেন:** "প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি স্বভাবতই ইসলামের দিকে ধাবিত হয়ে থাকে, কেননা (বিশ্বে) ইসলামই একক ধর্ম যা ইহকাল ও পরকালের পথে সমানভাবে দৃষ্টি দেয়।" (ঐ পৃ: ১৩০)

৩। ভারতের হিন্দু নেতা মি: গান্ধী বলেন:

"আমি যেমন ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করেছি হিন্দুরা যেন অনুরূপ ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করে, তবে তারা ইসলামের মর্যাদা দিবে, যেমন আমি মর্যাদা দেই। নিশ্চয়ই আমি নিশ্চিত যে ইসলাম ভুমন্ডলে তরবারীর মাধ্যমে তার অবস্থান নির্ণয় করেনি। (যা কতিপয় ইসলাম বিদ্বেষী মহলের ধারণা) বরং ইসলাম উক্ত স্থান দখল করে সরলতা, উদারতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে এবং যে শক্তি ও আমিত্ব নাবী মুহাম্মাদ অর্জন করেছিলেন তার অপব্যবহার বর্জনের মাধ্যমে।" (ঐ পৃ: ১৭৮)

৪। ডক্টর পোল বলেন: নিশ্চয়ই ইসলাম সমস্ত ধর্মের মধ্যে একমাত্র ধর্ম, যা তার সর্বোচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় অন্যায় ও অপকর্মের দিকে জাতির ধাবিত হওয়ার বহু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইসলামের গৌরবের জন্য

এটিই যথেষ্ট যে, পুরুষ বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে মানব বংশধরকে মহৎ ও পূত-পবিত্র করে এবং শরীয়ত ও আইনত নিষিদ্ধকৃত যিনা-ব্যাভিচার থেকে তাকে বিরত রাখে..। (আহমদ মুহাম্মাদ জামালের "মুফতারায়াত আলাল ইসলাম" দেখুন: আহমাদ ইবনে হাজারের "আল ইসলাম ওয়ার রাসূল... পৃ:১৭৯)

৫। ভারতের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাজেন্দ্র নারায়ণ লাল[1] বলেন: "ইসলাম খোদা প্রদত্ত সত্য

---

[1] (১) অধ্যাপক রাজেন্দ্র নারায়ণ লাল ১৯১৬ সালের ৮ই মার্চ ভারতের রাজস্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। বেনারসের কাশি এলাকায় তিনি শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। কুইন্স কলেজ থেকে ইন্টার্মেডিয়েট করার পর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৪০ সালে সনাতন হিন্দু ধর্ম ইতিহাসের উপর এম,এ ডিগ্রী লাভ করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গীতার উপর বিশেষ সনদ হাসেল করেন।

১৯৭৮ সালে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম "ইসলাম খোদা প্রদত্ত সত্য ধর্ম।" গ্রন্থের সংস্কৃতিক নাম হচ্ছে "ইসলাম এক শুদ্ধ ইশ্বরী জীবন ব্যবস্থা।"

গ্রন্থটি নয়াদিল্লীর সাহিত্য সুভ প্রকাশনী থেকে পুন: প্রকাশ ঘটে। লেখক তার চাঞ্চল্যকর বইটিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং ইসলাম ধর্মের উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। পাঠকদের খেদমতে তার হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কিছু কিছু কথা তুলে ধরা হল:

" হিন্দুদের মধ্যে নতুন দেবতার সিলসিলা বন্ধ হয়নি। নিত্য নতুন দেবতার আবিষ্কার প্রক্রিয়া নিয়মিত অব্যাহত আছে। এর মধ্যে সর্বশেষ আবিষ্কার হলো সন্তুসী মা দেবতার।"

চতুর্বেদ সম্পর্কে লেখক বলেন:

".. বেদের এ সমষ্টিতে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর মধ্যে শতকরা নিরানব্বই (৯৯%) ভাগ সম্পর্কে হিন্দুরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন বহু স্বরতি রয়েছে যেগুলোর মতামত/বক্তব্য পরস্পর বিরোধী।" তিনি আরো বলেন: "এই হিন্দু ধর্মে তিনটি মৌলিক দল রয়েছে যথা: বিষ্ণু, শিব এবং শক্তি। এরা সবাই একে অপরের বিরোধী। ... পিঁয়াজ রসুন পরিহারকারীরা যেমন হিন্দু, ঘৃন্য জাতির খাদ্য ভক্ষণকারীরাও অনুরূপ হিন্দু। হলুদ, পিতা পরিচিত সাধুরাও যেমন হিন্দু, জন্মলগ্নের

ধর্ম।" (সাপ্তাহিক সোনার বাংলা সংখ্যা: ২৫শে এপ্রিল ২০০৩ খৃ: শুক্রবার।)

বিবস্ত্র সাধুরাও তেমনই হিন্দু। বিষ্ণুদের মধ্যে মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। আবার শক্তিদের মধ্যে মাংস ভক্ষণ বৈধ।"

তিনি জাতি ও বর্ণ বৈষম্য সম্পর্কে বলেন:

ব্রাক্ষণবাদকে সম্মান দেয়ার ব্যাপারে এমন বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে, যার কারণে একজন ইতর প্রকৃতির ব্রাক্ষণ্যকে উপাসনার স্থান দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, সকল ভালগুণে গুণান্বিত নমশুদ্রজাতকে ততটুকু সম্মান দিতে প্রস্তুত না।

এ ক্ষেত্রে লেখক, গান্ধীজি আফ্রিকার নিগ্রো-হাবসীদের উপর অকথ্য নির্যাতন প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা তুলে ধরেন: "একজন জুলো সম্প্রদায়ের নিগ্রো আফ্রিকান যদি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে সাদা চামড়ার ইংরেজ খৃষ্টানরা তবু তাকে সমতার মর্যাদা দিতে রাজী নয়। কিন্তু সেই জুলো যখন ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে তখন তাকে উচ্চ পর্যায়ের একজন মুসলামানের সম্মানে স্থান দেয়া হয়।"

লেখক হিন্দু ধর্মের পরস্পর বিরোধী বিধান সম্পর্কে আরো বলেন: "পরলোকের ধারণা সম্পর্কে হিন্দু ধর্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মত পাওয়া যায়। সে স্বর্গ ও নরকের বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু আবার পুনরাগমন সম্পর্কেও একই সাথে বিশ্বাসী। শিখাসূত্র সম্পর্কিত এ ধর্মের ধারণা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বা রূপক।" এরপর তিনি বলেন:

"এ সমস্ত আলোচনা থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট সেটা হলো হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। এটা নানা ধরনের পরস্পর বিরোধিতার শিকার। বলতে গেলে এটা হচ্ছে পরস্পর বিরোধিতার সামষ্টিক ধর্ম। একেশ্বরবাদ এবং বহুদেবতাবাদ সেখানে একাকার।"

তিনি আরো বলেন:

"ডা: রাধাকৃষ্ণ এ ধর্ম থেকে আত্মিক খোরাক লাভ করতে পেরেছেন, অনুরূপ স্বামী বিবেকানন্দের মত বিরাট সংস্কারক এ থেকে সংস্কারের আলো খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন বটে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুগণ, সরল পন্থায় তাদের বর্তমান ধর্ম সম্পর্কে একটু চিন্তা করলেই এর মধ্যে তারা কিছুই পেতে পারেননা। তারা সবাই শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য হবেন যে, হিন্দুধর্ম একটি নিছক রহস্যময় জিনিস যার আবরণে রয়েছে শুধু তন্ত্রমন্ত্র। যার অপর নাম হচ্ছে ব্রাক্ষণ্যবাদ। ... নমশুদ্রদের জন্য এটা হচ্ছে নেহাত অপমানজনক ও পরম লাঞ্ছনার ধর্ম মাত্র।" সোনার বাংলা পত্রিকা থেকে সংকলিত, সাপ্তাহিক "সোনার বাংলা" ২৫শে এপ্রিল ২০০৩ শুক্রবার দরবারে হক নিবন্ধ।)

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করুন এ ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিদের কথার দিকে। দেখুন, বার্ণার্ডশ বলেছেন যে, ইসলাম ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিষয় নিয়ে এসেছে। ইহকালীন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হল, যেমন: লেনদেন-পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, কোম্পানী-শিল্পকলা, বিবাহ-শাদী, অন্যায়-অপরাধ, বিচার–শালিস, বিধি-বিধান, উত্তরাধিকার সম্পত্তি বিধান, রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি তাদের দেশসমূহ ও বাইরেও পরিব্যাপ্ত। অতএব, কোথায় ঐ সব স্বার্থান্বেষী মহল ও নাস্তিক সম্প্রদায় যারা রাষ্ট্রনীতি থেকে ধর্মকে ভিন্ন করার আহবায়ক। তারা বলে যে, নিশ্চয়ই ধর্ম হল ইবাদত- উপাসনা ও মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিচার বিধি-বিধান, রাজনীতি ও রাষ্ট্রের শাসন-প্রশাসনের ক্ষেত্রে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই। অতএব, এ ন্যায়পরায়ন প্রাচ্যবিদ ও অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ অবগত রয়েছেন যে, নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্ম মানবতার যা প্রয়োজন তা নিয়ে এসেছে। আর উপনিবেশবাদীদের লেজুড়ধারী ও কতিপয় গন্ডমুর্খই শ্লোগান দিয়ে থাকে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করার। তাদের মুখনি:সৃত বাণী কতই না নিকৃষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দিন।

ইসলাম ধর্মের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের কতিপয় নমূনা

প্রিয় পাঠক! ইসলামের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য কুলবিহীন সমুদ্র অর্থাৎ ইসলাম সম্পূর্ণই আদর্শ ও বৈশিষ্টমন্ডিত। এ ক্ষেত্রে আমি এ আশায় পাঠক সমীপে ইসলামের কতিপয় আদর্শ উল্লেখ করছি, তাঁরা যেন এ আদর্শগুলি গ্রহণ করেন এবং তাঁদের নিকট যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে এ সব আদর্শের জন্য ইসলাম সমস্ত ধর্মের উপর সার্বিক ক্ষেত্রে অগ্রগামী। আর এ জন্যেই এই শরীয়ত অন্য সমস্ত শরীয়তের পরিসমাপ্তকারী ও সার্বিক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ এবং এর নাবী সমস্ত নাবী-রাসূলের পরিসমাপ্তকারী। এবার গোঁড়ামী বর্জন করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়ুন ও বিবেচনা করুনঃ

ক। ইসলামী মৌলিক মতাদর্শ (ধর্মমত)

ইসলামের আগমন ঘটেছে সঠিক স্পষ্ট আদর্শ ধর্মমত নিয়ে। এ মতাদর্শের মধ্যে নেই কোন গরমিল, অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা, যা গ্রহণ করে থাকেন সুষ্ঠু-সঠিক বিবেকসম্পন্ন লোকেরা। এ মতাদর্শের মূল কথা হলো "তাওহীদ: (আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস) যে বিশ্বাস ধারণ করে তৃপ্ত হয় সুস্থ বিবেক ও তা সঠিক সহজাত প্রবৃত্তি ও স্বভাব মেনে নেয়। এ মতাদর্শ আহবান জানায় যে, জগতসমূহের একজনই উপাস্য, তাঁর কোন অংশীদার নেই,

অতএত একমাত্র তাঁরই উপাসনা করতে হবে। যিনি ছিলেন, যার কোন সূচনা নেই, যিনি থাকবেন যাঁর কোন অন্ত নেই। তিনিই জগতসমূহের স্রষ্টা, সমস্ত বান্দার স্রষ্টা, তিনি সমস্ত উত্তম নাম ও উচ্চ গুণাবলীতে ভূষিত। তিনি একক অদ্বিতীয়, কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর কোন তুলনা-সাদৃশ্য নেই "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্ব দ্রষ্টা" মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (سورة البقرة:١٦٣)

অর্থাৎ: আর তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য, সেই অতি দয়ালু দয়াময় ব্যতীত অন্য কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। (সূরা বাকারা:১৬৩) এবং তিনি আরো বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ ، تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (سورة البقرة٢٠-٢٣)

অর্থাৎ: হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত-উপাসনা কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ধর্মভীরু হও। যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ করেছেন এবং যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, অত:পর তার দ্বারা তোমাদের জন্য জীবিকা স্বরূপ ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত কর না।

আর আমি বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের সন্দেহ থাকলে তোমরা এর মত একটি সূরা (অধ্যায়) নিয়ে আস, তোমরা যদি সত্যবাদী হও (তোমাদের দাবীতে) তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে (এজন্যে) আহবান কর। (আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত ২১-২৩)

প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত আয়াত তিনটির প্রথম আয়াতে আদেশসূচক শব্দের মাধ্যমে মানবমণ্ডলীকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত-উপাসনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর কুরআনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত বাণী রয়েছে তার মধ্যে এটিই মানব জাতির জন্য প্রথম ও শ্রেষ্ঠ আদেশ। দ্বিতীয় আয়াতে নিষেধসূচক শব্দের মাধ্যমে মানব মণ্ডলীকে

তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করতে কড়া ভাবে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধও কুরআনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে সর্ব প্রথম মানব জাতির জন্যে নিষেধসূচক। অর্থাৎ আল্লাহ মানবজাতিকে কুরআনের অভ্যন্তরে সর্ব প্রথম তাঁর একত্বে বিশ্বাসের আদেশ করেন এবং সর্ব প্রথম নিষেধ করেন তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপনে। আর তৃতীয় আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মানব মণ্ডলীকে চ্যালেঞ্জ করেন যে, তোমরা যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি সন্দেহ পোষণ কর, তবে অনুরূপ সবাই মিলে তৈরি করে নিয়ে এস। এ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা উক্ত বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি শেষ দিবস পর্যন্ত কেউ পারবেও না। (আল হামদু লিল্লাহ)

যা কিছু ঘটেছে ও যা ঘটবে সব বিষয়ে তিনি সার্বিক অবগত। তিনি সকল বিষয়ে একক ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, তিনি ব্যতীত কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। মানুষের যাবতীয় ইবাদত- উপাসনার প্রাপ্য একমাত্র তিনিই, এক্ষেত্রে কারো অনুপরিমাণ অংশ নেই। তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রভুত্বে সৃষ্টিকর্তৃত্বে, তাদের জন্ম-মৃত্যুতে, রুজীর ব্যবস্থাপনায়, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় একক স্বত্ত্বার

অধিকারী, এ ক্ষেত্রেও তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁর অসংখ্য সুন্দর-সুন্দর নাম ও উচ্চগুণসম্পন্ন গুণাবলী রয়েছে। এগুলি কেউ তাঁর জন্য কোন অপব্যাখ্যা, রদবদল সাদৃশ্যস্থাপন,ও অস্বীকার না করে যেভাবে যে অর্থে বর্ণিত হয়েছে তা সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। ইবাদত-উপাসনার ক্ষেত্রে দুটি দিক বজায় রাখতে হবে, তবেই ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে নচেৎ নয়। প্রথম দিক একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই যাবতীয় ইবাদত করা। দ্বিতীয় সমস্ত ইবাদত নাবী মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত নিয়মাবলী অনুযায়ী করা। প্রার্থনা, ফরিয়াদ, জবাই-বলিদান-উৎসর্গ, মানসিক- ভোগদান, প্রভৃতি সবই ইবাদত-উপসনার অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। অতএব, এগুলি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হবে। অনেকের ধারণা যে, এসব আল্লাহর জন্য, কিন্তু অসীলা-মাধ্যম হিসেবে আমরা মৃত সৎ ব্যক্তি, মাজার, দর্গা-আস্তানায়, দূর্গা, কালী, লক্ষী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ওগুলো করে থাকি। এটি একেবারে ভ্রান্ত ধারণা, পার্থিব জগতের সাথে তুলনা করে আল্লাহর জন্য মাধ্যম ধরার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি সপ্ত আকাশের উপর তার আরশের উপর উন্নীত অবস্থায় তাঁর সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে সার্বিক পরিজ্ঞাত, তাঁর জ্ঞান তাঁর সাহায্য ও শক্তি সব জায়গায়

বিরাজমান। সুতরাং তাঁকে যে যেখান থেকে যখন আহবান করবে, তাঁর কাছে কিছু চাইবে তিনি তা শুনেন ও সাড়া দেন। যেমন আল্লাহ বলেন ,

﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (سورة غافر: ٦٠)

অর্থাৎ "তোমরা আমাকে আহবান কর আমি তোমাদেরকে সাড়া দিব।" (সূরা মুমেন: ১৬০) তিনি আরো বলেন:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

(سورة البقرة :١٨٦)

অর্থাৎ: (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন) "আর যখন আমার বান্দা-দাসগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (তখন তাদেরকে বলে দাও) নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী; আহবানকারী যখনই আমাকে আহবান করে তখনই আমি তার আহবানে সাড়া দিয়ে থাকি। সুতরাং তারাও যেন আমাকে সাড়া দেয় (আমার জন্য সৎ কর্ম করে) এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা সঠিক পথে চলতে পারবে।" (আল কুরআন, সূরা বাকারা,:১৮৬)

আল্লাহর প্রতি ঈমান-বিশ্বাস, ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত), আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থসমূহ যেমন,

তাওরাত, ইঞ্জিল (বাইবেল) যবূর,কুরআন ইত্যাদি, সমস্ত নাবী- রাসূল, পরকাল দিবস ও তাকদীরের (ভাগ্যের) ভাল মন্দ আল্লাহরই পক্ষ থেকে এসব বিশ্বাস ইসলামী মৌলিক ধর্মমতের অন্তর্ভুক্ত। আর এ ছয়টি হল ঈমানের রুকন-স্ত স্ত। এগুলির কোন একটির প্রতি অবিশ্বাস রাখলে সে মুসলমান হবে না। মহান আল্লাহ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত-বিধি বিধানকে শেষ দিবস কাল পর্যন্ত পরিপূর্ণ করেছেন। অতএব ধর্মীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে কারো বাড়ানো কমানোর কোন অধিকার নেই; কিছু যদি ইসলামের নামে করা হয় যা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত নয়, তাই ইসলামে বিদয়াত নামে অভিহিত।

আর এ সম্পর্কে নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী হলো:-

(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

অর্থাৎ: যারা আমাদের এই বিধি-বিধানের উপর নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তাই প্রত্যাখ্যাত। (আল হাদীস, বুখারী ও মুসলিম)।

অতএব, ধর্মের সব কিছু নাবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্ধারিত পথ অনুযায়ী করতে হবে এ ব্যতীত অন্যের প্রবর্তিত বা মনমত পদ্ধতিতে করলে তা

গ্রহণযোগ্য হবে না। তেমনি আল্লাহ্ প্রদত্ত ও তাঁর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত হালাল- হারাম (বৈধ-অবৈধের) সীমারেখা নির্ধারিত, এ সীমাও কেউ স্বেচ্ছায় লংঘন করতে পারে না। (বিস্তারিত দেখুন: ইসলামী সঠিক আকীদা ধর্মমতের উপর লিখা গ্রন্থাবলী)

খ। পবিত্রতা অর্জন

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন ইসলামের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। কখনো তা ফরয-অপরিহার্য আবার কখনো উত্তম। সুতরাং নর-নারীর সহবাস বা অন্য কারণে বীর্যপাত হয়ে অপবিত্র হলে এবং মহিলাদের ঋতুস্রাব ও প্রসূতিজনিত স্রাব থেকে মুক্ত হলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা অপরিহার্য। অনুরূপ নামায আদায়ের জন্য অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন ফরয এবং ঈদের দিন, জুমআর দিন হজ্জের সূচনা লগ্নে ও প্রভৃতি সময় গোসল-স্নান করা সুন্নাত, উত্তম ও পূণ্যের অন্তর্ভুক্ত।

সর্বজনবিদিত যে, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন মানুষকে ময়লা, অপরিষ্কার ও নোংরা থেকে পরিষ্কার করে থাকে, যা রোগ ব্যাধি ও দুর্গন্ধের কারণ। তেমনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করলে বিশেষ করে স্ত্রী সহবাসের পর বা অন্য কোন অপবিত্রতা থেকে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করলে

শরীর চাঙ্গা ও সতেজ হয়ে উঠে ও অলসতা দূর হয়। কেননা শরীর থেকে বীর্যপাত হলে দুর্বলতা ও অলসতা অনুভব হয় আর তা দূর হয় গোসলের মাধ্যমে, তেমনি ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবজনিত স্রাবোত্তর গোসল করলেও ময়লা, দুর্গন্ধ ও অলসতা দূর হয়।

গ। ইবাদত- উপাসনা

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর ইবাদত হল, আল্লাহ যা চান ও যাতে তিনি খুশী হন তা বান্দার কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে পালন করা।

অতএব, নামায আদায়, যাকাত প্রদান, রমাযানের রোযা, কাবার হজ্জ, দোয়া-প্রার্থনা, নযর-মানসিক, জবাই ইত্যাদি মৌলিক এবাদতের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে কতিপয় মৌলিক ইবাদতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল:

নামায

লক্ষ্য করুন নামাযের দিকে, মহান আল্লাহ বান্দার উপর তাদের মহা কল্যাণ ও উপকারার্থে দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। এর মাধ্যমে অর্জিত হয় বিরাট

পুরস্কার ও মাফ হয় পাপরাশি। নামাযের রহস্যাবলীর মধ্যে যেমন:

১। মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি অফুরন্ত উত্তম-উত্তম অনুগ্রহ দান করেছেন যেমন, সর্বোত্তম আকৃতি, জ্ঞান-বিবেক, বাকশক্তি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, উৎকৃষ্ট খাদ্য পানীয় এমনকি পৃথিবীর সব কিছুকেই আমাদের অধীন করে সেবার জন্য নিয়োজিত করেছেন। অতএব, এসবের কারণে ধর্মমত ও বিবেকের দাবী যে, এ অনুগ্রহদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। তাই সকলের উচিৎ, উত্তম রূপে সার্বিকভাবে বিবেকসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সুতরাং নামাযের মাধ্যমে জ্ঞানসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে, এবং অন্তরের একনিষ্ঠতা এবং ভয়ভীতি আশা-আকাঙ্খা প্রয়োগের দ্বারা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সার্বিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

২। নামায হলো বান্দা ও প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম। কারণ এর মধ্যে রয়েছে তাঁকে সার্বক্ষণিক স্মরণের সুব্যবস্থা। এজন্যই কিছু সময় অতিবাহিত হলেই আরেকটি নামাযের সময় উপস্থিত হয়ে যায় যাতে মানুষ প্রতিপালককে ভুলে না যায়। (বিস্তারিত দেখুন: আহমাদ বিন হাজারের আল ইসলাম ওয়ার রাসুল ...পৃঃ ৪৯-৫০)

এ ছাড়া নামাযের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি আন্ত রিকতা ও তাঁর নৈকট্য অর্জন, আদব-সম্মান প্রশংসা-গুণগান, দোয়া-প্রার্থনা, তাঁর জন্য বিনয়-নম্রতা, বান্দার পক্ষ থেকে প্রতিপালকের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন এবং তাঁর জন্য বড়ত্ব-মহত্ত ও পবিত্রতা প্রদর্শন--। যার ফলে হৃদয় ভরে যায় আল্লাহর মহত্ত, ভয় ও সম্মানে --।

আর এ নামায জামায়াতের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে আদায় করাতে অর্জিত হয় পরস্পরে পরিচয়, সুসম্পর্ক, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, সহানুভূতি, দয়া, করুণা এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ- মায়া, যা অর্জন হয়ে থাকে নামাযের বাস্তব শিক্ষা থেকে। (বিস্তারিত দেখুন: আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদের "মিন মাহাসিনিদ দ্বীন আল ইসলামী পৃঃ ১২-১৩)

ফল কথা, নামায মানুষকে পশুত্বের আচার-আচরণ ও অবস্থান থেকে মুক্ত করে স্রষ্টার আদর্শে উন্নীত করে।

যাকাত

মহান আল্লাহর বাণী:

﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

(سورة البقرة:٤٣)

অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর। (আল কুরআন, বাকারা, আয়াত:৪৩)
"রুকু" অর্থ মাথা নত করা, "রুকু" নামাযের একটি অংশ (স্তম্ভ) এর মাধ্যমে ফরয নামায জামায়াতের সাথে (একসাথে) আদায় করার নির্দেশ করা হয়েছে।

যাকাত প্রদান নি:সন্দেহে ইসলামের একটি বড় আদর্শ। যা এর তাৎপর্য ও উপকারিতাসমূহ বিচার করলে বুঝে আসবে। যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্রের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, অভাবীদের প্রয়োজন মিটানো হয়। ঋণগ্রস্ত দের ঋণ পরিশোধ করা হয়, দানশীলতার মত উত্তম চরিত্র সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে, কৃপণতার মত দুশ্চরিত্র থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। উপরন্তু যেমন: ইহকালের মোহ এবং এর মাধ্যমে ধন সম্পদের বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন হয়। আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদে সহায়তা লাভ, দরিদ্র ও অভাবীদের কুদৃষ্টি হিংসা-বিদ্বেষ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ফলকথা, এর মাধ্যমে আল্লাহর আদেশসহ সমাজ সংস্কার ও সংশোধনের বড় দায়িত্ব পালন হয়ে থাকে।

সিয়াম-রোযা

আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি রোযা ফরয করত: বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورة البقرة:١٨٣)

অর্থাৎ "হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপরও রোযাকে অপরিহার্য কর্তব্যরূপে নির্ধারিত করা হলো, যেন তোমারা সংযমশীল হতে পারো।" (আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত:১৮৩)

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, রোযা ও তার মধ্যে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার দিকে, রোযা মানুষের মধ্যে দরিদ্রের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে, কেননা মানুষ যখন ক্ষুধার্ত হয় তখন সে ক্ষুধার্ত ও দরিদ্রের কথা স্মরণ করতে পারে। রোযাদার পানাহার বর্জন করার ফলে তার প্রতি আল্লাহর যে অবদান, তা বুঝতে পেরে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। রোযা হৃদয়ের ধৈর্য ও সহনশীলতাকে শক্তিশালী করে। আর এ দুইগুণ রাগের উত্তেজনাকে প্রশমিত করে, কেননা, রোযা হলো ধৈর্যের অর্ধাংশ আর ধৈর্য হলো ঈমানের অর্ধাংশ। রোযা শরীরের মন্দ মিশ্রণকে পরিষ্কার করে, হৃদয়কে সংশোধিত করে, আত্মাকে পরিশোধিত করে, শরীরকে করে পবিত্র।

আভ্যন্তরীণ শক্তিতে এর আশ্চর্যজনক প্রভাব পড়ে ও এর ক্ষতিকারক দিক থেকে একে সংরক্ষণ করে। (বিস্তারিত দেখুন: "মিন মাহাসিনিদ দীন আল ইসলামী" পৃ: ২১)
ফল কথা, রোযা হলো একটি অন্যতম ইবাদত এবং মহান আল্লাহর আদেশের অনুসরণ।

রোযার মধ্যে কোন তাৎপর্য ও গুরুত্ব না মানা হলেও, যা কিছু চিকিৎসাবিদগণ এ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। যেমন: রোযা বহু স্থায়ী ও সংক্রামক রোগের ঔষধ। বিশেষ করে: যক্ষ্মা, ক্যান্সার, সিফিলিস (যৌন রোগ) ও চর্ম রোগ। তেমনি রোযা শরীরের ওজন হ্রাস করে ও স্থূলতা, (মাংসলতা) মেদ ও বদহজম দূর করে, পক্ষান্তরে, তা প্রাণ চাঞ্চল্য ও সুস্বাস্থ্য বয়ে নিয়ে আসে। বরং বর্তমান যুগে চিকিৎসাবিদগণ বহু রোগের রোযার মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করেছেন। বিশেষ করে, পাকস্থলীজনিত রোগ। কেননা রোযা যেন যাদুর কাঠি, রক্তজনিত রোগ সহ এসব রোগের দ্রুত নিরাময় করে থাকে, তারপর শিরাজনিত ব্যাধিও দূর করে থাকে। (বিস্ত ারিত দেখুন: আহমাদ বিন হাজারের "আল ইসলাম ওয়ার রাসূল পৃ:৫২)

হজ্জ

আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلِلَّــهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة آل عمران:٩٧)

অর্থাৎ, আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা সেসব মানুষের অবশ্য কর্তব্য যারা শারীরিক ও আর্থিকভাবে ঐ পথ অতিক্রমে সামর্থবান এবং যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ জগৎসমূহের মুখাপেক্ষী নন। (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৯৭)

মহান আল্লাহ সামর্থবানের উপর জীবনে একবার এই হজ্জ ফরয-অপরিহার্য করেছেন। যার ইহকাল ও পরকালের বহু উপকার রয়েছে। যেমন:

হজ্জ মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সম্মেলন, যার মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য থেকে মুসলমানগণ এক-অভিন্ন স্থানে একত্রিত হয়ে এক আল্লাহর ইবাদত-উপাসনায় অংশ গ্রহণ করে থাকে, হজ্জের মধ্যে তাদের হৃদয় আত্মা এক-অভিন্ন হয়ে থাকে। স্মরণ করে তাদের ধর্মীয় সম্পর্ক ও ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বকে।

হজ্জের ফলে অর্জিত হয়ে থাকে আত্মিক পবিত্রতা, দান-দক্ষিণা ও খরচের সুঅভ্যাস গড়ে উঠে, সৌন্দর্য ও

অহংকার বর্জন, কষ্ট সহ্যের অভ্যাস গড়ে উঠে এবং সমতা ও সমবেদনা বিবেচিত হয়। রাজা-প্রজা, আমীর-গরীব সবাই সেখানে সমান, পরস্পরে পরিচিতি ঘটে, আল্লাহর উপর অগাধ আস্থা ও ভরসা জাগে, কেননা সে সমস্ত ধন সম্পদ ও পরিবার পরিজন পরিহার করে একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করে চলে যায় সুদূর মক্কায়।

ফলকথা, এর মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ পালনের দ্বারা পাপাচার থেকে একেবারে মুক্ত হওয়া যায়। যেমন: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি হজ্জ করল, অত:পর সে অশ্লীল আচরণ ও পাপাচারে লিপ্ত হলো না, সে তার পাপমুক্ত হয়ে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করলো যেন তার মাতা তাকে সদ্য জন্ম দিল। (আল হাদীস, বুখারী ও মুসলিম)

প্রিয় পাঠক! অনুরূপ প্রত্যেকটি ইবাদত-উপাসনারই ইহকালীন ও পরকালীন উপকারিতা, তাৎপর্য ও গুরুত্ব রয়েছে।

ঘ। লেনদেন ও আদান প্রদান

ইসলামী আদর্শের মধ্যে লেনদেনের আদর্শও অন্যতম। ইসলামী শরীয়তে হারাম-অবৈধের সুনির্দিষ্ট

প্রমাণ ব্যতীত সর্ব প্রকার লেনদেন যেমন: ভাড়া প্রদান, কোম্পানি -অংশিদারিত্ব হালাল-বৈধ। আর হারাম হলো, যদি তাতে ক্ষতি, জুলুম-অন্যায়, ধোঁকাবাজি ও অজ্ঞতা বা এ ধরনের অন্য কিছু থাকে। এ ব্যতীত যার মধ্যে ধর্মীয় ও পার্থিব কোন ক্ষতি নেই বরং উপকার রয়েছে তার সার্বিক বৈধতা রয়েছে। ধর্মে সাধারণত: যা কিছু পূত-পবিত্র, উৎকৃষ্ট ও উপকারী তা হালাল সাব্যস্ত, যার মধ্যে রয়েছে শরীর, জ্ঞান এবং সম্পদের অপকার ও যা নিকৃষ্ট তাই হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ হলো, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, চুক্তি অটুট রাখা, প্রতিজ্ঞা ও ন্যায় পরায়ণতা বজায় রাখা। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ﴾

(سورة الأنعام:١٥٢)

অর্থাৎ, .. আর লেনদেনে পরিমাণ ও ওজন সঠিকভাবে করবে, আমি কারো উপর তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না, আর তোমরা যখন কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ানুগ কথা বলবে এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার

পূর্ণ করবে..। (আল কুরআন, সূরা আনআম:১৫২) এ ছাড়াও এ বিষয়ে বহু বাণী রয়েছে।

ঙ। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বণ্টন বিধি

মহান আল্লাহ নিজেই ভাগ-বণ্টন পদ্ধতি দূর-নিকট, লাভ-ক্ষতি ও পরস্পরে নিকটতম পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুক্ষ্মভাবে প্রণয়ন করেন। ব্যক্তির মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের জন্য যেভাবে তিনি বণ্টন-বিধি বিন্যস্ত করেছেন স্বচ্ছ,পূত-পবিত্র ও সঠিক বিবেক তার উত্তমতার সাক্ষ্য না দিয়ে উপায় নেই। পক্ষান্তরে, এই বণ্টন-বিধির দায়িত্ব যদি মানুষের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ও বিবেকের প্রতি ন্যস্ত হতো তবে অবশ্যই তাতে গরমিল, গণ্ডগোল, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও অগ্রহণযোগ্য বণ্টন-বিধি প্রকাশ পেত।

ইসলামী সুষ্ঠু বণ্টন বিধি স্পষ্টভাবে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে।

চ। অপরাধের প্রতিশোধ ও শাস্তি বিধান

অপরাধের শাস্তি, অন্যায় প্রতিরোধ, বিদ্রোহ দমন, নিষ্ঠুর-নির্দয়ের প্রতিহত ও স্বেচ্ছাচার দলকে উচিৎ শিক্ষা দেয়া হল অন্যতম ইসলামী আদর্শ।

(ক) কেসাস-প্রতিশোধ

মানুষের রক্ত সংরক্ষণের জন্য হত্যাকারীকে প্রতিশোধমূলক হত্যার বিধান প্রণীত হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

(سورة البقرة:١٧٩)

অর্থাৎ, হে জ্ঞানবান লোকেরা! কিসাসের (প্রতিশোধ গ্রহণের) মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। (সূরা বাকারা:১৭৯)

আল্লাহ অত্র আয়াতে কিসাসের রহস্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করেন। ইবনে কাসীর (রহঃ) অত্র আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন, "আল্লাহ বলেন: তোমাদের জন্য কিসাস অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যার বিধান প্রণয়নের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্যই নিগুঢ় রহস্য ও মহা তাৎপর্য, আর তা হলো প্রাণ রক্ষা। কেননা হত্যাকারী যদি জানতে পারে যে, নিশ্চয়ই তাকেও (হত্যার পরিবর্তে) হত্যা করা হবে, তবে সে তার কর্ম থেকে বিরত থাকবে, আর এরই মধ্যে রয়েছে বহু প্রাণের জীবন।" (তাফসীর ইবনে কাসীর)

আর এ রহস্য অনুধাবন করার শক্তি রয়েছে একমাত্র যারা প্রকৃত জ্ঞানবান।

(খ) চোরের হাত কাটা

অনুরূপ অঙ্গ কাটার মধ্যে রয়েছে সম্পদের সংরক্ষণ যার ফলে মানুষ প্রশান্তির সাথে নিরাপদে জীবন যাপন করবে, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَالسَّـــارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (سورة المائدة:٣٨)

অর্থাৎ, পুরুষ চোর এবং নারী চোরের হাতগুলি কেটে দাও, তা তাদের কৃত কর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি। আর আল্লাহই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়িদা, আয়াত:৩৮)

(গ) যিনা-ব্যাভিচারের শাস্তি

বংশবলী সংরক্ষণের জন্য হারাম- অবৈধ করা হয়েছে যিনা-ব্যাভিচার ও তার দিকে আকর্ষণকারী মাধ্যমসমূহ যেমন: অপরিচিতসহ পরিচিতের মধ্যে যে সব মহিলার সাথে বিবাহ বৈধ তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ, তাদের কারো সাথে নির্জনতা, তাকে চুম্বন দেয়া, স্পর্শ করা ও তার দিকে উত্তেজিতকারী অশ্লীল গান-বাজনা ইত্যাদি। ব্যাভিচারের ফলে প্রসারিত হয় নানা রকমের ব্যাধি, ক্ষুণ্ন হয় মান মর্যাদা ও সম্মান, বংশীয় সম্পর্কের মধ্যে ঘটে মিশ্রণ, নষ্ট হয়

বংশীয় সূত্র, সৃষ্টি হয় ঝগড়া-বিবাদ, প্রবাহিত হয় রক্ত এমনকি হত্যা পর্যন্ত হয়ে থাকে একে কেন্দ্র করে।
সুতরাং এর কুফল থেকে রক্ষার জন্যই বিবাহিত নারী-পুরুষ যদি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তার জন্য এবং সমকামীতার জন্য ইসলমী শরীয়ত জনসম্মুখে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও অবিবাহিত হলে, একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের দেশান্ত রের বিধান আরোপ করেছে। যাতে অন্যরা এ থেকে শিক্ষালাভ করে, বংশ ও আত্মসম্মান বজায় থাকে ও চরিত্র পূত-পবিত্র থাকে। আর ব্যাভিচারের কেউ যেন নিকটবর্তীও না হয় এজন্য আল্লাহর নির্দেশ হলো:

﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ (سورة الإسراء:٣٢)

অর্থাৎ, আর তোমরা ব্যাভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (আল কুরআন, সূরা বাণী ইসরাঈল, আয়াত:৩২)

ঘ) মদখোরের শাস্তি

অনুরূপ ইসলাম জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য হারাম-অবৈধ করেছে প্রত্যেক নেশা ও মাদকদ্রব্য, যেমন মদ, গাঁজা, আফিম, ও ধূমপান। আর মদকে অভিহিত করা হয়েছে সমস্ত নিকৃষ্টতা ও পাপাচারের

জন্মদাতা। কেননা মদ পানকারী যখন মাতাল হয় তখন সে যে কোন অপকর্মে লিপ্ত হতে পারে, এমনকি অন্যকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে অথচ সে তা বুঝবে না। তাই বহু ধরনের ক্ষতি যেমন, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অবক্ষয়, অমূল্য রত্ম জ্ঞান-বিবেক লোপ, এবং এতে রয়েছে অর্থের অপচয়। আর যদি কোন কিছুই ক্ষতি না হয়ে শুধু ধন-সম্পদের তুসরুপাত, ধর্মীয় কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন, মানক্ষুণ্ন ও ন্যায় পরায়ণতা বিলুপ্ত হয় তবেই তো এ থেকে জ্ঞানীর বিরত থাকার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু একে বলা হয়েছে সকল নিকৃষ্টতা ও অপকর্মের জন্মদাতা। তাই এ থেকে বাঁচার জন্যই মদ পানকারীর জন্য ৮০টি বেত্রাঘাতের বিধান করা হয়েছে, যেন অন্যরা তা দেখে শিক্ষা লাভ করে। এর অপকারিতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে সুষ্ঠ বিবেক নিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল প্রদর্শিত বিধি-বিধান মান্য করে উভয় কালীন কল্যাণ লাভে ধন্য হয়। মদের সাথে আল্লাহ জুয়াও হারাম করে ইরশাদ করেন:

﴿يَـــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْـــسٌ مِّـــنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّـــيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُـــدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ (سورة المائدة: ٩٠-٩١)

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী (আস্তানা) ভাগ্য নির্ণায়ক তীর গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ, সুতরাং তোমরা তা থেকে বিরত থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায়, তবে কি তোমরা বিরত হবে না? (আল কুরআন, সূরা মায়িদা, আয়াত:৯০-৯১)

(ঙ) সতীনারীকে অপবাদের শাস্তি

ইসলাম মান-সম্মান ইয্যত-আব্রু সংরক্ষণের জন্য নির্দোষ-নিরপরাধ ব্যক্তি ও সতী-সাধবী ও সরলানারীকে ব্যাভিচারের অপবাদ দিলে তাকে কঠোর হুঁশিয়ারীসহ শাস্তির বিধান দিয়েছে। এক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا

الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة النـــــور: ٤-٥)

অর্থাৎ, যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী, তবে যদি এরপর তারা তাওবা (প্রত্যাবর্তন)করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নূর, আয়াত: ৪-৫)

এ আয়াতের কিছু পরে আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (سورة النـــــور: ٢٣)

অর্থাৎ, যারা সতী-সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার (বিশ্বাসী) নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা পৃথিবী ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (সূরা নূর আয়াত:২৩)

প্রিয় পাঠক! উল্লেখিত শাস্তি-দণ্ড বিধানের ফলে মানুষ তার ও প্রাণের নিরাপত্তা সহ জ্ঞান, বংশ, ধন-সম্পদ ও মান সম্মানের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা লাভ করে থাকে যাতে সে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে।

৭। প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠা করত: প্রত্যেক পাওনাদারের পাওনা-অধিকার উপেক্ষা বা সীমালঙ্ঘন না করে প্রদান করা।

সুতরাং মহান আল্লাহ মানুষকে ন্যায় পরায়ণতা, কল্যাণ ও প্রত্যেকের অধিকার দেয়ার জন্য আদেশ করেন এবং এর জন্য প্রেরণ করেন নাবী-রাসূলদেরকে ও অবতীর্ণ করেন ঐশী গ্রন্থাবলী এবং প্রতিষ্ঠিত হয় ইহকালীন ও পরকালীন জীবন ব্যবস্থা।

পাঠকমন্ডলীর অবগতির জন্য ইসলাম যে অধিকার সংরক্ষণ করেছে তা সংক্ষিপ্তরূপ তুলে ধরা হলো:

১। মহান আল্লাহর অধিকার

এ অধিকার সবচেয়ে বড় ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং তা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। কেননা এটি মহান আল্লাহর অধিকার, যিনি মহা স্রষ্টা সকল কিছুর অধিপতি, সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক, যিনি চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী ও সর্বসত্ত্বার ধারক, যিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল, সুনিপুণ কৌশলে ও নিখুঁতভাবে সব কিছুকে সৃষ্টি করে ভাগ্য নিরুপণ করেন এবং যিনি আপনাকে অস্তিত্বহীন-শূন্য থেকে

সৃষ্টি করে অগণিত-অফুরন্ত কল্যাণ ও অনুগ্রহ দান করে মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে সার্বিক অবস্থায় প্রতিপালন করেন, এমনকি এক মুহূর্ত যার করুণা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই। যিনি মানুষের নিকট থেকে কোন প্রতিদান-বিনিময় চান না আর যা তিনি নির্দেশ করেন তা মানুষেরই কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আর তা হলো যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত-উপাসনা করবে যার কোন অংশীদার নেই, তাকে ছাড়া কারো ইবাদত তথা কারো জন্য মাথানত করবে না, কারো নিকট চাইবে না, প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করবে না, কারো উদ্দেশ্যে জবাই-বলি মানসিক ও ভোগ দেবে না, এগুলি কোন মৃত ব্যক্তির কবর-সমাধি বা আস্তানা বা কোন মাটির তৈরি মূর্তির সামনে ও উদ্দেশ্যে পালন না করে, সকল কিছুকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁরই উদ্দেশ্যে পালন করা হলো তাঁর অধিকার প্রদান ও তাঁর ইবাদত। আর এরই জন্য তিনি মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (سورة الذاريات: ٥٦)

অর্থাৎ: আমি জিন ও মানুষজাতিকে সৃষ্টি করেছি এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। (আল কুরআন, সূরা যারিয়াত: ৫৬)

তিনি অন্যত্র নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করে বলেন:

﴿قُــلْ إِنَّ صَــلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

(سورة الأنعام: ١٦٢-١٦٣)

অর্থাৎ, (হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বল! আমার নামায আমার ইবাদত (জবাই, হজ্জ) আমার জীবন ও আমার মরণ জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তার কোন শরীক-অংশীদার নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম মুসলমান। (আল কুরআন, সূরা আনয়াম, আয়াত:৬২-৬৩)

এটি হলো মানুষের উপর স্রষ্টার অধিকার, এরপর রয়েছে সৃষ্টির অধিকার।

২। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর অধিকার

এটি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে বড় অধিকার। তাঁর মৌলিক অধিকার হলো, তাঁর আদর্শ ও বিধি-বিধানের প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন ও তাঁর অনুসরণ, তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের যেসব বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, তিনি যা কিছুর নির্দেশ করেছেন তা পালন করা ও যা কিছু নিষেধ

করেছেন ও সাবধান করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং বিশ্বাস করা যে তাঁর নির্দেশনাই পরিপূর্ণ নির্দেশনা ও তার শরীয়ত-বিধি বিধানই পরিপূর্ণ, এর উপর অন্য কোন বিধি-বিধান, আইন-কানুন অগ্রাধিকার পেতে পারে না। যেমন আল্লাহ্ সবাইকে সতর্ক করে বলেন:

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾

(سورة النساء: ٦٥)

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন (মুসলমান) হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের ঝগড়া-বিবাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অত:পর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। (আল কুরআন,সূরা নিসা, আয়াত:৬৫)

তিনি আরো নির্দেশ দেন:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (سورة الحشر: ٧)

অর্থাৎ... রাসূল (মুহাম্মাদ) তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ

করেন তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর। (আল কুরআন, সূরা হাশর আয়াত: ৭)

৩। পিতা-মাতার অধিকার

সন্তানের উপর পিতা-মাতার যে অধিকার, গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। পিতা-মাতাই হলো সন্তানের অস্তিত্বের কারণ। অতএব, তাদের জন্য তার উপর রয়েছে বড় অধিকার। উভয়ে তাকে ছোট অবস্থায় প্রতিপালন করে এবং তার জন্য নিজেদের আরাম বর্জন করে কষ্ট স্বীকার করে। মাতা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে পেটে বহন, প্রসব ও দুগ্ধ পান সহ সার্বিক লালন পালন করে। এজন্য মহান আল্লাহ তাদের অধিকার সংরক্ষণ করত: তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًاوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (سورة الإسراء:٢٣-٢٤)

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত-উপাসনা না করতে ও পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে “উফ” (বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কোন কথা বল না) বল না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত করবে এবং বলবে হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত:২৩-২৪)

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ কুরআন মাজীদের বহুস্থানে নিজের অধিকারের পর পিতা-মাতার অধিকারের কথা উল্লেখ করেন, সুতরাং কথা, কাজ, আর্থিক ও শারীরিক দিক দিয়ে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা সন্তানের জন্য অপরিহার্য। অনুরূপ আল্লাহর অবাধ্যতা ও নিজের ক্ষতির ব্যাপার না হলে তাদের আদেশ মেনে চলাও অপরিহার্য।

৪। সন্তানের অধিকার

ছেলে-মেয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও সংসারের শোভা ও সৌন্দর্যের প্রতীক। তেমনি

পিতা-মাতার উপর সন্তানের প্রতি অনেক অধিকার রয়েছে। যেমন :

ক) সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন, তাদের অন্তরে সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রের বীজ বপণ করা। আল্লাহ্ বলেন:

﴿يَـــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (سورة التحريم:٦)

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নাম) আগুন হতে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। (আল কুরআন, সূরা তাহরীম:৬)

খ) সঠিক পন্থায় ভরণ পোষণ করা, না অতিরিক্ত না কম।

গ) সন্তানদের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতা বজায় রাখা কাউকে অন্যায় ভাবে বেশী না দেয়া, ইত্যাদি। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নিজেই এর সুফল ইহকাল ও পরকালে উপভোগ করবে।

৫। আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার

মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হলো সে তার পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের সাথে যেমন সদ্ব্যবহার ও আদব শ্রদ্ধা বজায় রাখে অনুরূপ অধিকার রয়েছে আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিও।

সুতরাং মুসলমান যে শ্রদ্ধা ও সদ্ব্যবহার করে থাকে পিতা-মাতার সাথে অনুরূপ সদ্ব্যবহার করতে হবে চাচা, ফুফু, মামা, খালার সাথে। নিজের বড় ভায়ের সাথে যে সদ্ব্যবহার করা হয় সে ব্যবহার করতে হবে স্বজনদের বড়দের সাথে, আপন ছোট ভাই, বোন, ভাতিজা ও ভাতিজিকে যে আদর স্নেহ-মায়া দেখানো হয় অনুরূপ করতে হবে স্বজনদের ছোটদের সাথে। অতএব, তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য তাই প্রত্যেকে যেন পরস্পর নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। পরস্পরে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা কথা কাজ আর্থিক ও শারীরিকভাবে বজায় থাকে। এ মর্মে আল্লাহর নির্দেশ হলো:

﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ (٢٦) سورة الإسراء

অর্থাৎ, আত্মীয় স্বজনকে দিবে তাদের অধিকার। (আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত:২৬)

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“.. (আত্মীয়ের মধ্যে) যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার সাথে তুমি সম্পর্ক বজায় রাখবে। যে তোমার প্রতি অন্যায় করবে তাকে তুমি ক্ষমা করবে। যে তোমাকে বঞ্চিত করবে তাকে তুমি প্রদান করবে। (বায়হাকী) তিনি এ উত্তম চরিত্র শিক্ষা দিয়েছেন সাহাবীদেরকে ।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: দরিদ্র-অভাবীকে দান করলে একটি সাদকা দানের নেকী আর আত্মীয় স্বজনকে দান করলে তাতে সাদকা-দানের ও সম্পর্ক বজায় রাখার ২টি নেকী। (ইবনে মাজাহ, নাসায়ী, তিরমিযী, হাসান)

এ বিষয়ে এ ছাড়াও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

৬। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

বিবাহের মধ্যে রয়েছে বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া ও পরস্পরের প্রতি দাবীর অপরিহার্যতা। সুতরাং বিবাহ হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক, যার ফলে অপরিহার্য হয়ে উঠে প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আর সে অধিকার হলো, দৈহিক, সামাজিক ও আর্থিক। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত পরস্পরে উত্তমরূপে জীবন যাপন করা। যেমন আল্লাহর নির্দেশ:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (سورة النساء:١٩)

অর্থাৎ, তাদের সাথে তোমরা সৎভাবে জীবন যাপন করবে। (সূরা নিসা: ১৯ আয়াত) তিনি বলেন:

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ (سورة البقرة:٢٢٨)

অর্থাৎ, নারীদের তেমনি ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। (আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত: ২২৮)

অতএব, স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার হলো:

১। ভরণ পোষণ অর্থাৎ পানাহার, পরিধেয় বস্ত্র, বাসস্থান এবং আনুষঙ্গিক যা কিছু প্রয়োজন সেগুলি সঠিকভাবে ব্যবস্থা করা। যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: স্ত্রীদের জন্য সদ্ভাবে পানাহার ও পরিধানের ব্যবস্থা করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। (তিরমিযী, আর তিনি এটিকে সহীহ বলেন)

২। তাদেরকে সুশিক্ষা, বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা দান করা।

৩। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, দুর্ব্যবহার না করা।

৪। তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূর্ণ করা।

৫। যদি একাধিক স্ত্রী হয় তবে তাদের মধ্যে সমতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

৬। তাদের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা। এছাড়াও অন্যান্য অধিকার ইসলাম নারীদের জন্য সংরক্ষণ করেছে।

স্ত্রীর উপর স্বামীর মৌলিক অধিকার

(১) স্বামী কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করবে স্ত্রীর উপর।

(২) স্ত্রী আল্লাহর অবাধ্য ও ধর্মের বিরোধিতায় না হলে স্বামীর আনুগত্য করবে।

৩। স্বামীর মান-সম্মান ও ধন সম্পদের সংরক্ষণ করবে।

৪। স্ত্রী এমন কিছু করবে না যার ফলে স্বামী তার পূর্ণ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

৫। স্বামীর এ অধিকার রয়েছে, যদি স্ত্রী সীমালঙ্ঘন করে, যেমন তাকে ব্যতীত অন্যের মাধ্যমে তার দৈহিক চাহিদা পূরণ বা ধর্মের অবাধ্য হয় তবে তাকে সংশোধন যোগ্য হলে সংশোধন করবে নচেৎ বিচ্ছেদ ঘটাবে।

৭। শাসক ও জনগণের অধিকার

ইসলাম শাসক ও শাসিতদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। শাসক বা নেতা দেশেরও হতে পারে, কোন গোষ্ঠীরও হতে পারে। সুতরাং শাসক ও সাধারণ প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অধিকার রয়েছে। অতএব, জনগণের অধিকার হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নেতার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত তা তাদের জন্য সঠিকভাবে পালন করা, প্রজাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণার্থে তার সকল কর্ম আঞ্জাম দেয়া এবং তাদের পূর্ণ অভিভাকত্ব গ্রহণ আর তা নাবী (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পন্থা অনুযায়ী পরিচালনা করা ইত্যাদি।

জনগণের উপর শাসকের অধিকার হলো: শাসকের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া, তিনি ভুলে গেলে বা উদাসীন হলে স্মরণ করিয়ে দেয়া। তিনি যেন বিপথগামী না হন ও তাঁর কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আল্লাহর অবাধ্য বা ধর্মের বিরোধিতায় না হলে তাঁর আদেশ মান্য করা। কেননা এর মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ আর অবাধ্যতা ও বিরোধিতায় রয়েছে নৈরাজ্য ও অকল্যাণ, এবং তাঁর কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বহু নির্দেশনা রয়েছে।

৮। প্রতিবেশীর অধিকার

প্রতিবেশী হলো আপনার নিকটে বসবাসকারী। ইসলাম প্রতিবেশীরও বড় অধিকার নির্ধারণ করেছে। প্রতিবেশী যদি আত্মীয় এবং মুসলমান হয় তবে তার প্রতি তিনটি অধিকার: প্রতিবেশী হওয়ার জন্য অধিকার, আত্মীয় হওয়ার অধিকার এবং ইসলামের অধিকার। আর যদি মুসলমান হয় কিন্তু আত্মীয় নয় তবে তার ২টি অধিকার, প্রতিবেশী ও ইসলামের। অনুরূপ যদি আত্মীয় কিন্তু মুসলমান নয়, তবে তারও ২টি অধিকার: প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের। আর যদি

আত্মীয় ও মুসলমান না হয়ে শুধু প্রতিবেশী হয় তবে তার মাত্র একটি অধিকার প্রতিবেশীর অধিকার। (তাফসীর ইবনে কাসীর সূরা নিসার ৩৬নং আয়াতের তাফসীর।)
এ বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ:

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُــرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَــتْ أَيْمَــانُكُمْ إِنَّ اللّــهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا﴾

(سورة النساء:٣٦)

অর্থাৎ, আর তোমরা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-অনাথ, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে। (সূরা নিসা, আয়াত: ৩৬)
সুতরাং প্রতিবেশীর উপর প্রতিবেশীর অধিকার হলো: সাধ্য মত অর্থ দিয়ে, সম্মান দিয়ে, সুপরামর্শ দিয়ে ও বিভিন্নভাবে উপকার করে তার সাথে সদ্ব্যবহার করা। এ মর্মে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী: আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিবেশী তারাই যারা আপন প্রতিবেশীর নিকট উত্তম। (তিরমিযী) তিনি আরো বলেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার

প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে।" (মুসলিম) তিনি বলেন: "যদি তুমি কোন তরকারী রান্না কর তবে তার ঝোল বাড়িয়ে দাও ও তোমার প্রতিবেশীর প্রতি দৃষ্টি রাখ।" (সহীহ মুসলিম) প্রতিবেশীকে উপঢৌকন প্রদান করাও সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এতে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

আর প্রতিবেশীর অধিকারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাকে কথায়, কাজে-কর্মে ও ব্যবহারে কষ্ট না দেয়া। এ বিষয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী: আল্লাহর শপথ ঐ ব্যক্তি মুমিন (মুসলমান) নয় (৩বার) সাহাবা কেরাম বলেন: কে সে, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেন: যার অন্যায়, অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (বুখারী)
অন্য বর্ণনায় আছে "সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

৯। সাধারণ মুসলমানের অধিকার

ইসলামের অন্যতম আদর্শ হলো, মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি অধিকার। আর তা বহু ধরনের , তার মধ্যে অন্যতম হলো যা বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধ 'মুসলিম শরীফ' গ্রন্থে: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
"মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার:
(১) যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করবে সালাম দিবে।

(২) যখন তোমাকে দাওয়াত-নিমন্ত্রণ করবে তার নিমন্ত্রণে সাড়া দিবে।
(৩) যখন সে তোমার নিকট থেকে উপদেশ কামনা করবে তুমি তাকে উপদেশ দিবে।
(৪) যখন সে হাঁচি দিয়ে 'আল হামদু লিল্লাহ' বলবে তুমি তার জবাব দিবে।
(৫) যখন সে রোগাক্রান্ত হবে তার দেখা-শুনা করবে।
(৬) যখন সে মারা যাবে তার জানাযায় শরীক হবে। (আল হাদীস, মুসলিম)
উল্লেখিত ছয়টি বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বহু অধিকার রয়েছে যেমন:
৭। মুসলমান নিজের জন্য যা ভাল ও যা মন্দ বিবেচনা করবে আপন মুসলমান ভাইয়ের জন্যও অনুরূপ বিবেচনা করবে যেমন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন (মুসলমান) হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপর ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা তার জন্যও অপছন্দ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)
"মুমিনরা (মুসলিমরা) একটি ভবন সদৃশ, এর একাংশ অপরাংশকে শক্তিশালী করে।" (মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: "একটি শরীর সদৃশ, যদি এক অঙ্গ আঘাত প্রাপ্ত হয় তবে সমস্ত শরীরে ব্যথা অনুভূত হয়।" (বুখারী-মুসলিম)

৮। পরস্পরে কষ্ট না দেয়া হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বিরত থাকা, মুসলমানকে কষ্ট দেয়া মহাপাপ। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "পরস্পরকে অবজ্ঞা, বিরোধিতা কর না, আল্লাহর বান্দা-দাস হিসেবে সবাই ভাই-ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলমান অন্য জনের ভাই তার প্রতি সে অন্যায় করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না,তাকে তুচ্ছ মনে করবে না .. প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান সম্মান হারাম–অবৈধ" (মুসলিম) আরো নির্দেশ হলো যেমন তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা, প্রতারণা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি।

১০। অমুসলিমদের অধিকার

সমস্ত কাফের (ইয়াহুদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক, নাস্তিক ইত্যাদি) অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। আর তারা চার শ্রেণীর:

যুদ্ধরত অমুসলিম:- যারা মুসলমানদের সাথে সংগ্রামে ও বিরোধিতায় লিপ্ত, তাদেরকে মুসলমানদের রক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা জরুরী নয়।

নিরাপত্তা গ্রহণকারী অমুসলিম:- যারা মুসলিম দেশে মুসলিম শাসকের নিকট নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপত্তা গ্রহণ করে, তাদের উপর ঐ নির্ধারিত স্থান ও সময়ে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ (سورة التوبة:٦)

অর্থাৎ, মুশরিকদের (অমুসলিম) মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দাও। (আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত:৬)

চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম:- যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ, যে সময় পর্যন্ত চুক্তি করা হয়েছে সে সময় পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করা অপরিহার্য, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা চুক্তির উপর অটল থাকবে এর কোন কিছুই ভঙ্গ করবে না, মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য করবে না, ইসলাম ধর্মকে বিদ্রুপ করবে না। কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (سورة التوبة:٤)

অর্থাৎ, তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন

ক্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি তাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সংযমশীলদেরকে পছন্দ করেন। (আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত:৪)

জিম্মি অমুসলিম: যারা ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া বা 'কর' দিয়ে বসবাস করে, ইসলামে এদের অধিকার ও দায়িত্ব অন্য অমুসলিমদের চেয়ে অধিকতর। কেননা তারা কর দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের তত্ত্বাবধানে বসবাস করে থাকে। সুতরাং মুসলিম শাসকের উচিত যে, তাদের জান, মাল, সম্মানের উপর ইসলামী বিধি-বিধান আরোপ, যা কিছু তারা হারাম-অবৈধ মনে করে সে সব ক্ষেত্রে বিধি আরোপ এবং তাদের বিপদাপদ, দুঃখ কষ্ট দূরীকরণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

অনুরূপ সাধারণ মুসলমানের যদি অমুসলিম প্রতিবেশী হয় তবে তার জন্য প্রতিবেশীর যে অধিকার সাব্যস্ত তা আদায় করা অপরিহার্য। (উপরোক্ত অধিকারসমূহ ইবনে উসাইমীনের "ইসলাম স্বীকৃত অধিকার" নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

১১। পশু-পাখী ও জীব-জন্তুর অধিকার

ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্তর্ভুক্ত হলো, জীব-জন্তুরও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যেমন:

(১) ক্ষুধার্ত-পিপাসিত জীব-জন্তুকে পানাহার করান, কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "প্রত্যেক জীবিত আত্মার (তৃপ্তকরার) মধ্যে রয়েছে নেকী।" (আহমাদ ও ইবনে মাজাহ, সহীহ) "যারা পৃথিবীতে আছে তাদের প্রতি দয়া কর তাহলে যিনি আকাশের উপরে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (আল হাদীস, তাবারানী ও হাকেম, সহীহ)

(২) জীব-জন্তুকে কোনরূপে কষ্ট না দেয়া, (তবে কষ্টদায়ক জীব-জন্তুকে হত্যা করা বৈধ।) যেমন: হাদীসে আছে, একজন ব্যভিচারী মহিলা একটি কুকুরকে পানি পান করানোর ফলে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। অন্যজন একটি বিড়ালকে বন্দী রাখে এবং জমিনের খাদ্য খাবার খাওয়ার জন্য তাকে ছেড়ে দেয়নি সে জন্য সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

প্রিয় পাঠক! অধিকার সম্পর্কিত যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে এছাড়াও বহু ধরনের অধিকার ইসলাম সংরক্ষণ করে, এখানে শুধু উদাহরণ স্বরূপ সংক্ষেপে আলোকপাত

করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীদের প্রতি এ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী পড়ার অনুরোধ রইল।

প্রিয় পাঠক! ইত:পূর্বে ইসলামের যে আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা নিছক নমুনা মাত্র। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে ইসলাম ধর্মটাই পুরাপুরি আদর্শময়।

এ অল্প পরিসরে আপনাদের খিদমতে এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের যেভাবে ইঙ্গিত ইমাম আব্দুল ফাত্তাহ স্বীয় গ্রন্থ 'আত্ তাফসীর আল আসরী আল কাদীম' এ বর্ণনা করেছেন তা কতিপয় উপস্থাপন করলাম।

এক নজরে ইসলাম ধর্মের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই যাতে সর্বক্ষেত্রে বিবেক ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন হয়েছে।

২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যার মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হলো, সমস্ত নাবী-পয়গাম্বর এবং রাসূল ও আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্রন্থাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন পরিপূর্ণ ধর্ম নেই, যার মধ্যে মানুষের সার্বিক সমস্যার সমাধান রয়েছে।

৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যা সর্ব কালের সর্ব জাতির জন্য উপযোগী।

৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যার প্রত্যেক কর্ম পালন করা সহজসাধ্য।

৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যার মধ্যে না আছে বাড়াবাড়ি-সীমালঙ্ঘন ও না আছে শিথিলতা-অবহেলা।

৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যা স্বীয় ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থকে সুসংরক্ষিত (রদবদল-পরিবর্তন থেকে) রাখতে পেরেছে।

৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যার অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ সর্ব শ্রেণীর লোকের জন্য।

৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম সমস্ত কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুমোদন দেয়।

১০। ইসলাম ছাড়া বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। (ইতিহাস সাক্ষী)

১১। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম নেই, যার মধ্যে রয়েছে সকল মানুষের জন্য পার্থিব বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এক আইন।

১২। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যার মধ্যে রয়েছে পরিপূর্ণতার সাথে সামাজিক ন্যায় বিচার ।

১৩। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যে ধর্ম শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতাকে বর্জন করে পরামর্শের নির্দেশ করে।

১৪। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যা শত্রুর সাথেও ন্যায় পরায়ণতার আদেশ দেয়।

১৫। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যা নারী সমাজকে তাদের শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্ত করে, মাতৃত্ব, অর্ধাঙ্গিনী ও কন্যার পর্যায়ে নিয়ে আসে।

১৬। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যা হলুদ-লাল আর শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গদের ভেদাভেদ দূর করে সমতা এনেছে।

১৭। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যা জ্ঞানার্জনকে অপরিহার্য করে কল্যাণকর জ্ঞান-বিদ্যাকে গোপন করা হারাম—অবৈধ করে।

১৮। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যার বিধি-বিধান বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের সাথে একমত।

১৯। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যাতে ধনীদের সম্পদের এক সামান্য অংশকে নির্ধারণ করে দরিদ্রদেরকে প্রদানের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র উভয়কে মুক্তি দেয় ।

২০। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যা সমস্ত সৃষ্টিজীবের প্রতি অনুগ্রহ, সদয় হওয়া ও কোমল আচরণের আদেশ করে।

২১। ইসলাম ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই, যা মানুষের স্বাস্থ্য ও সম্পদের সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দেয়। (সংক্ষেপিত)

(আত তাফসীর আল আসীর আল কাদীম ৩য় খণ্ড, দেখুন: "আল ইসলাম ওয়ার রাসূল ফী নাযারি মুনসিফী আশ-শারক ওয়াল গারব।" লেখক আহমাদ ইবনে হাজার বুত্বামী পৃঃ ১১৭-১১৯ ও আব্দুল্লাহ বিন জারুল্লাহ প্রণীত 'কামালুদ্দীন আল ইসলামী.. পৃঃ ৮১-৮৬)

এক নজরে ইসলাম ধর্মের কতিপয় আদর্শ ও গুণাবলী

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত-উপাসনা। কুসংস্কার বর্জন। জ্ঞান-বিবেক, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, জান-প্রাণ ও ধর্মের যত্ন ও সংরক্ষণ। সর্ব ক্ষেত্রে এমনকি অমুসলিমদের সাথেও ন্যায় প্রতিষ্ঠা। সর্ব ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায় নিষিদ্ধ বরং এর জন্য রয়েছে কড়া হুঁশিয়ারী ও শাস্তির বিধান। সকল মানুষের মধ্যে সমতা-সাম্য বজায়, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো, রাজা-প্রজা, বড়-ছোট কারো উপর কারো আল্লাহ ভীরুতা ছাড়া প্রাধান্য নেই। সুতরাং যে যত আল্লাহ ভীরু সে তত অধিক মর্যাদাবান। শ্রেণীমত সমস্ত মানুষের অধিকার সংরক্ষণ এবং শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব না দেয়া। উত্তম চরিত্র লালন করা যেমন: সততা, বিশ্বস্ততা, উত্তম আচরণ, প্রফুল্লতা, অঙ্গীকার রক্ষা, দানশীলতা, বড়দের সম্মান-ছোটদের স্নেহ, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরীক হওয়া, দাওয়াত-নিমন্ত্রণ করলে গ্রহণ করা, জীবের প্রতি দয়া, দরিদ্র এতীম-অনাথ ও বিধবাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও খোঁজ খবর নেয়া এবং এদের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন। কাউকে কষ্ট না দেয়া। মুসলমানের মর্যাদা বজায়

সুতরাং তার রক্ত, সম্পদ ও সম্মান নষ্ট করা হারাম, যদি কেউ মারা যায় ছোট বাচ্চা হলেও তার জন্য জানাযার নামায আদায়। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার বিশেষ করে যখন তারা বৃদ্ধ ও দুর্বল, এমনকি মৃত্যুর পরেও তাদের অধিকার রয়েছে; তাদের জন্য প্রার্থনা, তাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের উপদেশ বাস্তবায়ন করা। আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার, মৃত্যের আত্মীয়দের শোক জ্ঞাপন-সান্তনা প্রদান, জানাযায় শরীক, দাফন করা তাদের জন্য দোয়া করা এবং মৃত্যের পরিবারের জন্য খাবার পরিবেশন ইত্যাদি।

তথ্য সূত্র ও সহায়ক গ্রন্থাবলী
(বাংলা)

১। আল কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১২তম মুদ্রণ, ১৪২০ হিজরী।

২। আল কুরআনুল কারীম, বাংলা তাফসীর অনুবাদঃ প্রসেফর ড: মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, প্রকাশক, দারুস সালাম, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ, ১৪২২ হিজরী, ২০০১ খৃঃ।

৩। ইসলাম স্বীকৃত অধিকার, ইবনে উসাইমীন (রাহেঃ) অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রব্ব আফ্‌ফান, পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার, রিয়াদ, ১৪২৪ হিজরী, ২০০৩ খৃঃ।

৪। **অথর্ববেদ-সংহিতা** অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ শ্রী বিজন বিহারী গোস্বামী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০০০৭, চতুর্থ প্রকাশ, ১০ই নভেম্বর ২০০০ খৃঃ ২৪ শে কার্ত্তিক ১৪০৭ বাংলা।

৫। **ঋগ্বেদ সংহিতা**- ১ম খণ্ড, অনুবাদঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত হরফ প্রকাশনী, এ-২২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা, ৭০০০০৭। শুক্রবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০০ খৃঃ ৫ই ফাল্গুন ১৪০৬ সাল বাংলা।

৬। "**পুরাণ**" মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত সচিত্র "**শ্রীমদ্ভাগবত**" দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ সমগ্রমূল ভাগবতের

গদ্যানুবাদ, অনুবাদঃ ডঃ বিজন গোস্বামী। (৩৬টি পুরাণের মধ্যে এই ভাগবত পুরাণই ভারত বর্ষে সর্বাধিক প্রচলিত।) প্রকাশনায়ঃ মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা ৭০০০০৯, জানুয়ারী, ১৯৯৯ খৃঃ, মাঘ ১৪০৫ সাল বাংলা।

৭। মহা মুনি বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন পণীত সচিত্র কাশি দাসী 'মহা ভারত'। মহা কবি কাশি রাম দাস কর্ত্তৃক পদ্য ছন্দে বিরচিত, উপদেষ্টা নরেশ চন্দ্র শাস্ত্রী, প্রাক্তন অধ্যাপক সংস্কৃত বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কামিনি প্রকাশালয়, ৫ নবীন চন্দ্র পাল লেন, কলিকাতা, **৭০০০০৯, ১৯৯৬ খৃঃ।**

৮। হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেব লীলা, মুন্সী মুহাম্মাদ মেহেরুল্লাহ, ঢাকা ২০০৩ খৃঃ।

৯। আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম, আবুল হোসেন ভট্রাচার্য, নওমুসলিম কল্যাণ সংস্থা, ষষ্ট প্রকাশ, ১৯৯৬ ইং, আধুনিক প্রেস মুদ্রণ, ঢাকা।

১০। সাপ্তাহিক "সোনার বাংলা" শুক্রবার ১২ই বৈশাখ ১৪১০ বাংলা, ২৫ এপ্রিল ২০০৩ খৃঃ।

১১। ইঞ্জিল শরীফ, বাংলা অনুবাদ, বি, বি, এস, ১৯৮০ খৃঃ, আঞ্জুমান প্রিন্টিং প্রেস ঢাকা ১০০০।

১২। বেদ ও পুরাণে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ধর্মাচার্য ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়,

রহমানিয়া লাইব্রেরী, দ: ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭ খৃ: ।
১৩। হিন্দুত্ব ও ইসলাম মুরতাহিন বিল্লাহ ফজলি, অনুবাদ: মনিরুদ্দীন খান, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা- ৭০০০০৭৩, ২য় প্রকাশ ২০০১ইং।
১৪। কল্কী অবতার এবং মুহাম্মাদ, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ড: বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, ইলাহাবাদ।
১৫। নরাশন্স ও অন্তিম ঋষি, ড: বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, ইলাহাবাদ।

(আরবী)

১৬। 'তাফসীরুল কুরআন আল আযীম', ইবনে কাসীর, মুয়াসসাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত, লেবনান, ১৪১৭ হিজরী ১৯৯৬ খৃ: ।
১৭। তাফসীর সাদী, প্রকাশক মুয়াস্সাতুর রিসালাহ ৭ম পৃ: ।
১৮। সহীহুল বুখারী, ফাতহুলবারী, ইবনে হাজার, দারুল কুতব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, ১৯৮৯ খৃ: ।
১৯। সহীহ মুসলিম, শারাহ নওয়াবী, দারুল মারেফা, বৈরুত, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১৭ হিজরী, ১৯৯৬ খৃ: ।

২০। আওনুল মাবূদ, শারাহ্ আবু দাউদ, আজীমাবাদী, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরুত -লেবানন ১৯৯০ খৃ:, ১৪১০ হিজরী খৃ: ।
২১। তুহফাতুল আহওয়াযী, শারাহ তিরমিজী, মুবারকপুরী, দারুল কতুব আল ইলমিয়া, লেবানন।
২২। সুনান নাসায়ী, দারুল মা'রেফা, বৈরুত, ১৯৯৭খৃঃ।
২৩। সুনান ইবনে মাজাহ দারুল মা'রেফা, বৈরুত, ১৯৯৭খৃঃ।
২৪। বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর, দারুল মা'রেফা, বৈরুত, ১৯৯৯ খৃঃ।
২৫। আসালীবুদ দাওয়া আল ইসলামিয়া আল মুয়াসারাহ ডঃ হামাদ বিন নাসের আল আম্মার, দার ইশবিলিয়া, ১৯৯৮খৃ: ।
২৬। আদইয়ানুল হিন্দ আল কুবরা, ডঃ আহমাদ শালাবী, মাকতাবাতুন নাহজাহ আল মাসরিয়া, কাইরো, ১৯৯৯খৃঃ।
২৭। দিরাসাতু ফিল ইয়াহুদিয়া ওয়াল মাসিহিয়া ওয়া আদইয়ানুল হিন্দ, ডঃ মুহাম্মাদ জিয়াউর রহমান আলআজমী মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ২০০১ খৃঃ।
২৮। শারহু সালাসাতিল উসূল, শায়খ ইবনে উসাইমীন, দারুস সুরাইয়া, ১৯৯৮ খৃঃ।

২৯। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিন্দু কিতাবূঁ মে, ইবনে আকবার আল আজমী, দারুস সাফা পাবলিকেশন্স পাকিস্তান, ১৯৯৮খৃঃ।
৩০। আল ইসলাম ওয়ার রাসূল .., আহমাদ বিন হাজার আলে বূত্বামী, মাকতাবাতুস সাক্বাফাহ, কাত্বার, ১৩৯৮হিজরী।
৩১। আল হিকমাহ ফিদ দাওয়াহ ইলা আল্লাহ, সাঈদ বিন আলী আল কাহত্বানী, মুয়াসসাসাতুল জুরাইসী, রিয়াদ, ১৯৯৭খৃঃ।
৩২। ইজহারে হাক্ব, রহমাতুল্লাহ হিন্দী, দারুল ইফতা ও ইসলামী গবেষণা বিভাগ রিয়াদ,
৩৩। মিন মাহাসিনিদ দ্বীন আল ইসলামী আব্দুল আজীজ বিন মুহাম্মাদ আস সালমান, রিয়াদ, ১৪২১হিজরী।
৩৪। আসাহহুল আদইয়ান লিল ইনসান, আকীদাতান ওয়া শরীয়াতান, আহমাদ আব্দুল গাফুর আত্তার, মক্কা, ১৪০০ হিজরী, ১৯৮০ খৃঃ।
৩৫। কামালুদ দ্বীন আল ইসলামী.." আব্দুল্লাহ বিন জারুল্লাহ আলে জারুল্লাহ, ধর্ম মন্ত্রনালয় সৌদী আরব, রিয়াদ, ১৪১৮হিজরী. ১৯৯৮ খৃঃ।
৩৬। ফি মাহাসিনিল ইসলাম মিন হাদিয়ে খাইরিল আনাম" মুহাম্মাদ বিন আলী আল আরফাজ, দারুস সামীঈ, রিয়াদ।

৩৭। আল ইসলাম দ্বীন কামেল, মুহাম্মাদ আল আমীন বিন মুহাম্মাদ আল মুখতার আশ শানকীতি, দারুল ইফতা ও ইসলামী গবেষণা বিভাগ, রিয়াদ, ১৪১৯ হিজরী, ১৯৯৯ খৃ:।
৩৮। রিসালাতান: (১) আত তারীফ বিল ইসলাম ওয়া মাহাসিনহু (২) আশ শরীয়া আল ইসলামিয়া ওয়া মাহাসিনহু.. " শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহেমাহুল্লাহ) ঐ ১৯৯৯ইং।
৩৯। (ইসলামী বিশ্বকোষ) আল মুউসুয়া আল মুয়াসসারাহ ফিল আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব ওয়াল আহযাব আল মুয়াসারাহ, ওয়ামী, রিয়াদ, ১৪১৮ হিজরী, ১৯৯৮ খৃ:।
৪০। আর রাহীকুল মাখতূম, সফীউর রহমান মুবারকপূরী, দারুল কিতাব ওয়াস সুন্না, পাকিস্তান, ১৪১৬ হিজরী, ১৯৯৬ খৃ:।
৪১। মুসলিমু আহলিল কিতাব.. ড: মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস সুমাই, দারুল ফুরকান, রিয়াদ ১৪১৭ হিজরী ১৯৯৭ খৃ:।
৪২। নাযরাতান নাঈম, (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন চরিত বিশ্বকোষ) তত্ত্বাবোধায়ক: সালেহ বিন হুমাইদ ইমাম মসজিদে হারাম, ও আব্দুর রহমান মাল্লুহ, দারুল ওয়াসীলা জিদ্দা, ১৪১৮ হিজরী ১৯৯৮ খৃ:।

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

الحمـــد لله رب العـــالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد

لقـــد قـــرأت كـــتاب "الدين المختار" والذي قام بإعداده داعية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعـــية الجاليات بغرب الديرة بمدينة الرياض ، فوجدته كتاباً حافلاً بالمعلومات عما يتعلق بمحاسن الديـــن الإسلامي والبراهين القاطعة التي وردت في الكتب الدينية غير الإسلامية ، والتي تدل على أن الإســـلام هو دين الحق وأن محمداً ﷺ هو رسول الله إلى خلقه ، وخاتم أنبيائه ، لعل الله يهدي به صدوراً ، ويفتح به قلوباً من الجاليات البنغالية غير المسلمة لاتباع صراطه المستقيم .

نســـأل الله لـــنا وله التوفيق لما يحبه ويرضاه ، وأن يجعلنا جميعاً هداة مهتدين، وأن يوفقنا لخدمة دينه وإعلاء كلمته، إنه خير مسؤول .

قاله : أبو سلمان عبدالحميد الفيضي

الداعية بمكتب الدعوة بمحافظة المجمعة

وحيث إن اللغة البنغالية هي إحدى اللغات الحية في منطقة كبيرة من شبه القارة الهندية ، وينطق بها أهلها من المسلمين وغير المسلمين ؛ فلهم حق واجب لمعرفة رسالة الإسلام الصحيحة بلغتهم المحلية البنغالية ؛ فانطلاقاً من هذا الشعور الإسلامي ، والإدراك الدعوي ، وإسهاماً في القيام بأداء المسئولية الدعوية قدر المستطاع ؛ فكَّر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في غرب الديرة بمدينة الرياض بإعداد كتاب باللغة البنغالية ، ويتناول هذا الكتاب الحديثَ عن محاسن الإسلام وغيرها ، بأسلوب سهل ميسور ، وبطريقة واضحة بَيِّنة المعالم لا غموض فيها ؛ فقام الأخ العزيز الشيخ محمد عبدالرب بن عفان خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، والداعية في المكتب المذكور بإعداد هذا الكتاب النافع المهم خير قيام ، وبذل فيه جهده و وقته على الرغم من كثرة مشاغله الدعوية ، وسمّاه باسم (الدين المختار) .

وقد وفقني الله تعالى للاطلاع عليه من أوله إلى آخره فألفيته كتاباً نافعاً قيماً .

فجزى الله تعالى مؤلف هذا الكتاب ، والقائمين على هذا المكتب وعلى رأسهم الشيخ عبداللطيف بن محمد العبد اللطيف مدير المكتب كل خير في الدارين ، وأجزل لهم المثوبة .

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه ومراجعيه وقارئه وكل من ساهم في إخراجه بهذه الصورة الطيبة ، إنه سميع كريم مجيب الدعوات ، وصلى الله تعالى على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين .

كتبه الفقير إلى غفران ربه

محمد مرتضى بن عائش محمد

رئيس مركز الدعوة السلفية في جندر بارا .

مرشد آباد ، البنغال الغربية الهند .

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

الحمـــد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين ، أما بعد :

فإن الدعوة إلى دين الله الحق من أوجب الواجبات على المسلمين ؛ قال الله تعالى : ﴿ادْعُ إِلَــى سَــبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [1] . وذلك لأن بقاء هذا الدين وانتشاره يتوقف بإذن الله على القيام بالدعوة المتواصلة إليه ، بكل الوسائل الشرعية والميسرة ، وبكل الأساليب المشروعة المؤثرة ، وفي كل المجتمعات البشرية ، ولكل الشعوب والأجناس والأقوام في العـــالم ، مع مراعاة أحوال الناس وظروف المجتمعات المختلفة ، وبدون أي تمييز عنصري ؛ لعل الله عز وجـــل بهـــذه الدعوة المخلصة يهدي إليه من يريد الهداية في أي لحظة من الأوقات ، وفي أي بقعة من الأمـــاكن ؛ حيـــث "كان الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال الشر بأصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة ؛ لأن الشر إنما جاءه من قِبَل القوى الحيوانية التي فيه ، وأما من حيث هو إنسان فهو إلى الخير وخلاله أقرب " [2] ، قال تعالى : ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [3] .

نعـــم ، إن الله سبحانه وتعالى قد وضع في عقول الناس وقلوبهم حسن هذا الدين الإسلامي ، الميل إليه والمحـــبة له ، والرغـــبة فـــيه ، وهذه هي حقيقة الفطرة ، ومن خرج عن هذا الأصل ، فذلك بسبب العوارض البيئية والاجتماعية المنحرفة التي قد تعرضت لفطرته؛ فأفسدها .

---

[1] . سورة النحل ، جزء من الآية ١٢٥ .

[2] . مقدمة ابن خلدون للإمام عبدالرحمن بن ابن خلدون ، المكتبة العصرية للطباعة النشر صيدا ، بيروت ، طبعة عام ١٤٢٤هـــ -٢٠٠٣ صـــ ١٣٣ .

[3] . سورة الروم ، جزء من الآية ٣٠ .

من المهم أن الكتاب "الدين المختار " فلا شك أن المؤلف تناول فيه جوانب دقيقة من محاه
الإســلام وشموليــته وشرفه وفضله على الأديان كلها بأن الإسلام دين وعقيدة ارتضاه ا
للبشــرية كافــة ليسعدوا به في الدنيا والآخرة، وقد أبدع المؤلف في بيان أن الإسلام د
عــالمي كمــا أنه دين الفطرة وسهل ميسر وأن كله خير ويناسب لجميع الأحوال البشرية
واخــتار في ذلك طريق الإيجاز والتنقيح فترك الغث والسمين وأخذ الثمين الصحيح واعتد
في ذلــك على أوثق المصادر ألا وهو كتاب الله الخالق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و
من خلفه تنــزيل من حكيم حميد والسنة النبوية الغراء .

والمؤلف قد بذل غاية جهده في عرض الأدلة على صدق الرسالة المحمدية لا في ضوء القرآ
والسنة فحسب بل في ضوء الكتب السماوية الأخرى ، والكتب الهندوسية المقدسة عنده
عرضــاً جــيداً فذكر أسماء النبي و ألقابه الواردة في كتبهم من بوران والفيدات وراماين
مهابهارت ، فأعتقد أن الكتاب المذكور سوف يخلف أثراً ملموساً في قلوب غير المسلمين م
الهــندوس خاصــة لــو قرأوه بتدبر وتفكر فلا شك أن المؤلف كل ما بذله من جهد علم
يستحق التقدير ويستوجب الثناء .

فأســأل الله القديــر أن يقبل جهوده ويوفقه لمزيد من خدمة الإسلام والمسلمين وأن يتلق
الكــتاب بالقــبول بين الخواص والعوام وعم نفعه إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محم
وسلم .

كتبه / د. عبدالله فاروق السلفي

الأستاذ المساعد لقسم الدعوة والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية في شيتاغونغ، بنغلاديش

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

لحمــد لله الذي ارتضى الإسلام من بين الأديان ديناً فجعله كاملاً وشاملاً ومبيناً والصلاة لســـلام على من أنزل عليه القرآن فرقاناً وعلى آله وصحبه الذين ما تركوا للناس بياناً ،
ا بعد :-

سعد قلبي و تقر عيني أن أعبر عما في خاطري من الانطباعات والانشراح للنفس من هذا كـــتاب الـــذي ألفه أخي العزيز الداعية محمد عبدالرب عفان بـــ عنوان "الدين المختار " للغـــة البنغالية وقبل أن أقوم بتقييم هذا الكتاب وأبين مدى أهميته يجدر بي أولاً أن أصرح ـأني أحببت المؤلف منذ طفولته ، لا لأنه من أسرتي و مصدر دمي بل ذلك لأنه كان حاملاً لقـــه وورعه النبيل الذي يفتخر به الآخرون ويشار إليه بالبنان منذ صباه منتميا إلى أسرة ـــتهرت في المجـــتمع بالدين والمعرفة والثقافة الإسلامية ، فكان جده الذي جدي العلامة دايـــة الله المرشـــدآبادي من كبار الدعاة إلى الله الذي كان تخرج على يدي العلامة السيد .يـــر حســـين المحـــدث الدهلـــوي إمام أهل الحديث في عصره وكان أبوه الذي هو عمي مطوف الشيخ عفان بن هداية الله عالماً جليلاً ومتمسكا بالسنة وله مؤلفات بالبنغالية وكان ـــه أســـلوب فريد في خطبة الجمعة في ضوء تفسير القرآن الكريم وعمه الشيخ العلامة أبو ىمـــان عبدالمنان بن هداية الله صاحب التصانيف الكثيرة يُعد في طليعة العلماء السلفيين في غلاديش والجدير بالذكر أن أبا زوجته العلامة عبدالله بن الفضل كان أحد مشاهير الخطباء ، بـــنغلاديش الذي كان أوتى مهبة نادرة في الوعظ و روعة البيان وكان ينطبق عليه قول رســـول ﷺ "وإن مـــن البيان لسحراً" وكان ممتازاً في جميع مراحله الدراسية حيث أنه أتم راسته الأخيرة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

الحمـــد لله رب العـــالمين والصـــلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبدالله إمام الدعاة وس
المرسلين .

فقـــد اطلعـــت على ملخص (باللغة العربية) لكتاب "الدين المختار" الذي قام بتأليفه فضيلة الأ
محمـــد عـــبدالرب عفان – داعية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الد
بالرياض – وقد تبين لي أن الكتاب يمتاز بما يلي:

١ – أن هدف الكتاب دعوة غير المسلمين عامة والهندوس خاصة .

٢ – أن محتويات الكتاب كلها مدللة بالكتاب والسنة ومن كتب الأديان المقدسة الأصلية المعتم
لدى غير المسلمين .

٣ – أن عرض الكتاب مرتب ومنسق ومبسط .

٤ – أن لغة الكتاب سهلة ومفهومة ومناسبة لجميع المستويات .

٥ – أن الكتاب تمت مراجعته من جهات معتمدة وأشخاص موثوقين في المنهج والعقيدة .

وأخـــيراً أوصـــي بطباعة هذا الكتاب المبارك وتوزيعه للتعريف لمحاسن الإسلام بين الناطقين بالل
البنغالـــية ، ســـائلاً المـــولى سبحانه وتعالى أن يجزي الأجر والمثوبة لمؤلفه ولكل من دل أو سعى
طباعته ونشره .

كتبه/

أخوكم/ د. ناجي بن إبراهيم العرفج

١٤٢٩ ..

١٤٢٥هـ

الوكيل المساعد بكلية الشريعة-فرع جامعة الإمام في الأحساء

معد ومقدم برنامج (فهم الإسلام) في القناة الثانية السعودية

مؤلف سلسلة البحث عن الحقيقة (رسالة واحدة فقط)

محتويات "الدين المختار"

الدين المختار (اللغة البنغالية)

تأليف: محمد عبد الرب عفان

(أيم أيم دكا والليسانس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

تقديم / فضيلة الشيخ الدكتور / ناجي بن إبراهيم العرفج

الوكيل المساعد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء

مراجعة

فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله فاروق السلفي

فضيلة الشيخ / مرتضى بن عائش محمد

طالب الدكتورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

فضيلة الشيخ / عبدالحميد الفيضي

خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

فضيلة الشيخ / محمد سيف الله بن مزمل

خريج جامعة الملك سعود بالرياض

فضيلة الشيخ / سيف الدين بلال

خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تنضيد الحروف

محمد عبدالواسع بن عبدالقيوم

إشراف

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة بالرياض

من أهداف المكتب

١ – تعريف غير المسلمين بدين الإسلام ودعوتهم إليه، ترغيبهم فيه، مشافهة، مراسلة، واستماعاً .

٢ – تصحيح عقائد المسلمين وتنقيتها من الشرك وشوائبه .

٣ – نشر العلم الشرعي بين الجاليات المسلمة .

٤ – توعية المسلمين وتوجيههم وإرشادهم إلى ما يصلح الحال ويسعد المآل .

٥ – الدعوة إلى ترك البدع والخرافات الموجودة عند بعض المسلمين .

تأليف

محمد عبد الرب عفان

(إيم أيم دكا والليسانس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

تقديم

فضيلة الشيخ الدكتور / ناجي بن إبراهيم العرفج

(الوكيل المساعد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالأحساء ـ السعودية)

إشراف

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة بالرياض

ص ب /١٥٤٤٨٨ الرياض ١١٧٣٦ هاتف / ٤٢٩١٩٤٢ فاكس / ٤٢٩١٨٥١
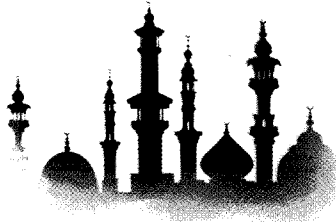
المملكة العربية السعودية

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ص.ب /١٥٤٤٨٨ الرياض ١١٧٣٦ ـ تقاطع شارع الريس مع شارع عسير

هاتف /٤٣٩١٩٤٢ فاكس /٤٣٩١٨٥١

حساب رقم ٩٣٤٠٤ شركة الراجحي المصرفية فرع سلطانة

The Cooperative Office For Call & Guidance

To Communities at Western Diraah - Riyadh

P.O.Box :154488 - Riyadh 11736 -Tel :4391942-Fax :4391851

ردمك: ٢ ـ ٧ ـ ٩٤٧٥ ـ ٩٩٦٠